পল্লী সমাজ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

—প্রাপ্তিস্থান—

সরকার এণ্ড কোং

১১৩, আখিল মিস্ত্রি লেন,

কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীপ্রদীপকুমার সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ :
৫ই মাঘ, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ :
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
কালীমাতা প্রিন্টার্স
১৯, ডি/এইচ/১৪ গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

মূল্য—দশ টাকা

॥ এক ॥

বেণী ঘোষাল মুখুয্যেদের অন্দরের প্রাঙ্গণে পা দিয়াই সম্মুখে এক প্রৌঢ় রমণীকে পাইয়া প্রশ্ন করিল, এই যে মাসি, রমা কৈ গা ?

মাসি আহ্নিক করিতেছিলেন, ইঙ্গিতে রান্নাঘর দেখাইয়া দিলেন। বেণী উঠিয়া আসিয়া রন্ধনশালার চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, তা হ'লে রমা, কি করবে স্থির করলে ?

জ্বলন্ত উনান হইতে শব্দায়মান কড়াটা নামাইয়া রাখিয়া রমা মুখ তুলিয়া চাহিল, কিসের বড়দা ?

বেণী কহিল, তারিণী খুড়োর শ্রাদ্ধের কথাটা বোন ! রমেশ ত কাল এসে হাজির হয়েছে। বাপের শ্রাদ্ধ খুব ঘটা করেই করবে বলে বোধ হচ্ছে—যাবে না কি ?

রমা দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া বলিল, আমি যাব তারিণী ঘোষালের বাড়ি ?

বেণী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, সে ত জানি দিদি। আর যেই হোক, তোরা কিছুতেই সেখানে যাবি নে। তবে শুনচি নাকি ছোঁড়া সমস্ত বাড়ি-বাড়ি নিজে গিয়ে ব'লবে—বজ্জাতি বুদ্ধিতে সে তার বাপেরও ওপরে যায়—যদি আসে, তা হ'লে কি বলবে ?

রমা সরোষে জবাব দিল, আমি কিছুই বলব না—বাইরের দারোয়ান তার উত্তর দেবে।

পূজানিরতা মাসির কর্ণরন্ধ্রে এই অত্যন্ত রুচিকর দলাদলির আলোচনা পৌঁছিবামাত্রই তিনি আহ্নিক ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিলেন। বোনঝির কথা শেষ না হইতেই অত্যুত্তপ্ত খৈএর মত ছিটকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, দারোয়ান কেন ? আমি বলতে জানিনে ? নচ্ছার ব্যাটাকে এমনি বলাই বলব যে, বাছাধন জন্মে কখনো আর মুখুয্যেবাড়িতে মাথা গলাবে না। তারিণী ঘোষালের ব্যাটা ঢুকবে নেমন্তন্ন করতে আমার বাড়িতে ? আমি কিছুই ভুলিনি বেণীমাধব ! তারিণী তাব ছেলের সঙ্গেই আমার রমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল। তখনও ত আর আমার যতীন জন্মায় নি—ভেবেছিল, যদু মুখুয্যের সমস্ত বিষয়টা তাহ'লে মুঠোর মধ্যে আসবে—বুঝলে না বাবা বেণী ! তা যখন হ'ল না, তখন ঐ ভৈরব আচায্যিকে দিয়ে কি-সব জপ-তপ, তুকতাক করিয়ে মায়ের কপালে আমার এমন আগুন ধরিয়ে দিলে যে, ছ'মাস পেরুল না বাছার হাতের নোয়া মাথার সিঁদুর ঘুচে গেল। ছোটজাত হয়ে চায় কিনা যদু মুখুয্যের মেয়েকে বৌ করতে ! তেমনি হারামজাদার মরণও হয়েছে—ব্যাটার হাতের আগুনটুকু পর্যন্ত

পেলে না। ছোটজাতের মুখে আগুন! বলিয়া মাসি যেন কুস্তি শেষ করিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। পুনঃপুনঃ ছোটজাতের উল্লেখে বেণীর মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল, কারণ তারিণী ঘোষাল তাহারই খুড়া। রমা ইহা লক্ষ্য করিয়া মাসিকে তিরস্কারের কণ্ঠে কহিল, কেন মাসি তুমি মানুষের জাত নিয়ে কথা কও? জাত ত আর কারুর হাতে-গড়া জিনিস নয়? যে যেখানে জন্মেচে সেই তার ভাল।

বেণী লজ্জিতভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল, না রমা, মাসি ঠিক কথাই বলেচেন। তুমি কত বড় কুলীনের মেয়ে, তোমাকে কি আমরা ঘরে আনতে পারি বোন! ছোটখুড়োর এ কথা মুখে আনাই বেয়াদবি। আর তুকতাকের কথা যদি বল ত সে সত্যি। দুনিয়ায় ছোটখুড়ো আর ঐ ব্যাটা ভৈরব আচায্যির অসাধ্য কাজ কিছু নেই। ঐ ভৈরব ত হয়েচে আজকাল রমেশের মুরুব্বি।

মাসি কহিলেন, সে ত জানা কথা বেণী। ছোঁড়া দশ-বারো বছর ত দেশে আসেনি—এত দিন ছিল কোথায়?

কি করে জানব মাসি। ছোটখুড়োর সঙ্গে তোমাদেরও যে ভাব, আমাদেরও তাই। শুনচি এতদিন নাকি বোম্বাই না কোথায় ছিল। কেউ বলচে ডাক্তারি পাশ করে এসেচে, কেউ বলচে উকিল হয়ে এসেচে, কেউ বলচে সমস্তই ফাঁকি ছোঁড়া নাকি পাঁড় মাতাল। যখন বাড়ি এসে পোঁছল, তখন দুচোখ নাকি জবাফুলের মত রাঙ্গা ছিল।

বটে? তা হলে তাকে ত বাড়ি ঢুকতে দেওয়াই উচিত নয়!

বেণী উৎসাহভরে মাথার একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, নয়ই ত! হাঁ রমা, তোমার রমেশকে মনে পড়ে?

নিজের হতভাগ্যের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ায় রমা মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল। সলজ্জ মৃদু হাসিয়া কহিল, পড়ে বৈ কি! সে ত আমার চেয়ে বেশি বড় নয়। তা ছাড়া শীতলাতলার পাঠশালে দুজনেই পড়তাম যে। কিন্তু তার মায়ের মরণের কথা আমার খুব মনে পড়ে। খুড়ীমা আমাকে বড় ভালবাসতেন।

মাসি আর একবার নাচিয়া উঠিয়া বলিলেন, তার ভালবাসার মুখে আগুন। সে ভালবাসা কেবল নিজের কাজ হাসিল করবার জন্যে। তাদের মতলব ছিল, তোকে কোনমতে হাত করা।

বেণী অত্যন্ত বিজ্ঞের মত সায় দিয়া কহিল, তাতে আর সন্দেহ কি মাসি! ছোটখুড়ীমার যে,

কিন্তু তাহার বক্তব্য শেষ না হইতেই রমা অপ্রসন্নভাবে মাসিকে বলিয়া উঠিল, সে-সব পুরনো কথায় দরকার নেই মাসি।

রমেশের পিতার সহিত রমার যত বিবাদই থাক, তাহার জননীর সম্বন্ধে

রমার কোথায় একটু যেন প্রচ্ছন্ন বেদনা ছিল। এতদিনেও তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। বেণী তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিলেন, তা বটে। ছোটখুড়ী ভালমানুষের মেয়ে ছিলেন। মা আজও তাঁর কথা উঠলে চোখের জল ফেলেন।

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়ে দেখিয়া বেণী তৎক্ষণাৎ এ-সকল প্রসঙ্গ চাপা দিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, তবে এই ত স্থির হ'ল দিদি, নড়চড় হবে না ত?

রমা হাসিল। কহিল, বড়দা, বাবা বলতেন আগুনের শেষ, ঋণের শেষ, আর শত্রুর শেষ কখনো রাখিস নে মা। তারিণী ঘোষাল জ্যান্তে আমাদের কম জ্বালা দেয়নি—বাবাকে পর্যন্ত জেলে দিতে চেয়েছিল। আমি কিছুই ভুলিনি বড়দা, যতদিন বেঁচে থাকব, ভুলব না। রমেশ সেই শত্রুরই ছেলে ত! তা ছাড়া আমার ত কিছুতেই যাবার জো নেই। বাবা আমাদের দুই ভাইবোনকে বিষয় ভাগ করে দিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু সমস্ত বিষয় রক্ষা করার ভার শুধু আমারই উপর যে! আমার ত নয়-ই, আমাদের সংস্রবে যারা আসে, তাদের পর্যন্ত যেতে দেব না। একটু ভাবিয়া কহিল, আচ্ছা বড়দা, এমন করতে পার না যে, কোনও ব্রাহ্মণ না তাদের বাড়ি যায়?

বেণী একটু সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, সেই চেষ্টাই ত করচি বোন। তুই আমার সহায় থাকিস, আর আমি কোনও চিন্তা করি নে। রমেশকে এই কুঁয়াপুর থেকে না তাড়াতে পারি ত আমার নাম বেণী ঘোষাল নয়। তার পরে রইলাম আমি, আর ঐ ভৈরব আচায্যি। আর তারিণী ঘোষাল নেই, দেখি এ ব্যাটাকে কে রক্ষা করে।

রমা কহিল, রক্ষে করবে রমেশ ঘোষাল। দেখো বড়দা, এই আমি বলে রাখলুম, শত্রুতা করতে এও কম করবে না।

বেণী আরও একটু অগ্রসর হইয়া একবার এদিক-ওদিক নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া চৌকাঠের উপর উবু হইয়া বসিল। তারপর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু করিয়া বলিল, রমা, বাঁশ নুইয়ে ফেলতে চাও ত, এই বেলা, পেকে গেলে আর হবে না তা নিশ্চয় বলে দিচ্চি। বিষয়-সম্পত্তি কি করে রক্ষে করতে হয়, এখনও সে শেখে নি—এর মধ্যে যদি না শত্রুকে নির্মূল করতে পারা যায় ত ভবিষ্যতে আর যাবে না; এই কথাটা আমাদের দিবারাত্রি মনে রাখতে হবে যে, এ তারিণী ঘোষালেরই ছেলে—আর কেউ নয়?

সে আমি বুঝি বড়দা।

তুই না বুঝিস কি দিদি! ভগবান তোকে ছেলে গড়তে গড়তে মেয়ে গড়েছিলেন বৈ ত নয়। বুদ্ধিতে একটা পাকা জমিদারও তোর কাছে হটে যায়, এ কথা আমরা সবাই বলাবলি করি। আচ্ছা, কাল একবার আসব। আজ বেলা হ'ল যাই, বলিয়া বেণী উঠিয়া পড়িল। রমা এই প্রশংসায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়-সহকারে কি একটু প্রতিবাদ করিতে গিয়াই তাহার বুকের

ভিতর ছাঁৎ করিয়া উঠিল। প্রাঙ্গণের একপ্রান্ত হইতে অপরিচিত গম্ভীরকণ্ঠের আহ্বান আসিল রাণী, কৈ রে ?

রমেশের মা এই নামে ছেলেবেলায় তাহাকে ডাকিতেন। সে নিজেই এতদিন তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। বেণীর প্রতি চাহিয়া দেখিল তাহার সমস্ত মুখ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই রুক্ষ-মাথা, খালি-পা উত্তরীয়টা মাথায় জড়ানো—রমেশ আসিয়া দাঁড়াইল। বেণীর প্রতি চোখ পড়িবামাত্র বলিয়া উঠিল, এই যে বড়দা, এখানে ? বেশ চলুন, আপনি না হ'লে করবে কে ? আমি সারা গাঁ আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্চি। কৈ রাণী কোথায় ? বলিয়াই কপাটের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পালাইবার উপায় নাই, রমা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। রমেশ মুহূর্তমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মহাবিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল, এই যে ! আরে ইস, কত বড় হয়েছিস রে ? ভাল আছিস ?

রমা তেমনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ কথা কহিতেই পারিল না। কিন্তু রমেশ একটুখানি হাসিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, চিনতে পাচ্ছিস রে ? আমি তোদের রমেশদা !

এখনও রমা মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। কিন্তু মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আপনি ভাল আছেন ?

হাঁ ভাই, ভাল আছি। কিন্তু আমাকে আপনি কেন রমা ? বেণীর দিকে চাহিয়া একটুখানি মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, রমার সেই কথাটা আমি কোনদিন ভুলতে পারিনি বড়দা ! যখন মা মারা গেলেন, ও তখন ত খুব ছোট। সেই বয়সেই আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল, রমেশদা, তুমি কেঁদ না, আমার মাকে আমরা দু'জনে ভাগ করে নেব।—তোর সে কথা বোধ করি মনে পড়ে না রমা, না ? আচ্ছা, আমার মাকে মনে পড়ে ত ?

কথাটা শুনিয়া রমার ঘাড় যেন লজ্জায় আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। সে একটি-বারও ঘাড় নাড়িয়া জানাইতে পারিল না যে, খুড়ীমাকে তাহার খুব মনে পড়ে। রমেশ বিশেষ করিয়া রমাকে উদ্দেশ করিয়াই বলিতে লাগিল, আর ত সময় নেই, মাঝে শুধু তিনটি দিন বাকি, যা করবার করে দাও ভাই, যাকে বলে একান্ত নিরাশ্রয়, আমি তাই হয়েই তোমাদের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েচি। তোমরা না গেলে এতটুকু ব্যবস্থা পর্যন্তও করতে পারচি না।

মাসি আসিয়া নিঃশব্দে রমেশের পিছনে দাঁড়াইলেন। বেণী অথবা রমা কেহই যখন একটা কথারও জবাব দিল না, তখন তিনি সুমুখের দিকে সরিয়া আসিয়া রমেশের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, তুমি বাপু তারিণী ঘোষালের ছেলে না ?

রমেশ এই মাসিটিকে ইতিপূর্বে দেখে নাই ; কারণ সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার পরে ইনি রমার জননীর অসুখের উপলক্ষ্যে সেই যে মুখুয্যেবাড়ি ঢুকিয়াছিলেন আর বাহির হন নাই। রমেশ কিছু বিস্মিত হইয়াই তাহার দিকে

চাহিয়া রহিল। মাসি বলিলেন, না হলে এমন বেহায়া পুরুষমানুষ আর কে হবে? যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা! বলা নেই, কহা নেই, একটা গেরস্তর বাড়ির ভিতর ঢুকে উৎপাত করতে শরম হয় না তোমার?

রমেশ বুদ্ধিভ্রষ্টের মত কাঠ হইয়া চাহিয়া রহিল।

আমি চললুম, বলিয়া বেণী ব্যস্ত হইয়া সরিয়া পড়িল।

রমা ঘরের ভিতর হইতে বলিল, কি বোক্‌চ মাসি, তুমি নিজের কাজে যাও না —

মাসি মনে করিলেন, তিনি বোনঝির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা বুঝিলেন। তাই কণ্ঠস্বরে আরও একটু বিষ মিশাইয়া কহিলেন, নে রমা, বকিস্‌ নে। যে কাজ করতেই হবে, তাতে আমার তোমাদের মত চক্ষুলজ্জা হয় না। বেণীর অমন ভয়ে পালানর কি দরকার ছিল? বলে গেলেই ত হ'ত। আমরা বাপু তোমার গোমস্তাও নই, খাস-তালুকের প্রজাও নই যে, তোমার কর্মবাড়িতে জল তুলতে, ময়দা মাখতে যাবো। তারিণী মরেচে, গাঁ-সুদ্ধ লোকের হাড় জুড়িয়েচে,—এ কথা আমাদের ওপর বরাত দিয়ে না গিয়ে নিজে ওর মুখের ওপর বলে গেলেই ত পুরুষমানুষের মত কাজ হ'ত।

রমেশ তখনও নিস্পন্দ অসাড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। বস্তুতঃই এ-সকল কথা তাহার একান্ত দুঃস্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ভিতর হইতে রান্নাঘরে কপাটের শিকলটা ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া নড়িয়া উঠিল। কিন্তু কেহই তাহাতে মনোযোগ করিল না। মাসি রমেশের নির্বাক ও অত্যন্ত পাংশুবর্ণ মুখের প্রতি চাহিয়া পুনরপি বলিলেন, যাই হোক, বামুনের ছেলেকে আমি চাকর-দরোয়ান দিয়ে অপমান করাতে চাইনে—একটু হুঁশ করে কাজ ক'রো বাপু— যাও। কচি খোকাটিও নও যে, ভদ্দরলোকের বাড়ির ভেতরে ঢুকে আবদার করে বেড়াবে! তোমার বাড়িতে আমার রমা কখনও পা ধুতেও যেতে পারবে না, এ তোমাকে আমি বলে দিলুম।

হঠাৎ রমেশ যেন নিদ্রোত্থিতের মত জাগিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই তাহার বিস্তৃত বক্ষের ভিতর হইতে এমনি গভীর একটা নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল যে, সে নিজেও সেই শব্দে সচকিত হইয়া উঠিল। ঘরের ভিতর কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। রমেশ একবার বোধ করি ইতস্ততঃ করিল, তাহার পরে রান্নাঘরের দিকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, যখন যাওয়া হতেই পারে না, তখন আর উপায় কি! কিন্তু আমি ত এত কথা জানতাম না—না জেনে যে উপদ্রব করে গেলাম, সেজন্য আমাকে মাপ ক'রো রাণি? বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতে এতটুকু সাড়া আসিল না। যাহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা হইল, সে যে অলক্ষ্যে নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, রমেশ তাহা জানিতেও পারিল না। বেণী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে পালায় নাই, বাহিরে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র। মাসির সহিত চোখাচোখি হইতেই তাহার সমস্ত মুখ আহ্লাদে ও হাসিতে ভরিয়া গেল,

সারয়া আসিয়া কহিল, হাঁ, শোনালে বটে মাসি! আমার সাধ্যিই ছিল না অমন করে বলা? এ কি চাকর-দরোয়ানের কাজ রমা! আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম কিনা, ছোঁড়া মুখখানা যেন আষাঢ়ের মেঘের মত করে বার হয়ে গেল। এই ত—ঠিক হ'ল!

মাসি ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুরে বলিলেন, খুব ত হ'ল জানি; কিন্তু এই দুটো মেয়েমানুষের ওপর ভার না দিয়ে, না সরে গিয়ে নিজে বলে গেলেই ত আরও ভাল হ'ত! আর নাই যদি বলতে পারতে, আমি কি বললুম তাকে, দাঁড়িয়ে থেকে শুনে গেলে না কেন বাছা? অমন সরে পড়া উচিত হয়নি!

মাসির কথার ঝাঁজে বেণীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। সে যে এই অভিযোগের কি সাফাই দিবে ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, হঠাৎ রমা ভিতর হইতে তাহার জবাব দিয়া বসিল, এতক্ষণ সে একটি কথাও কহে নাই। কহিল, তুমি যখন নিজে বলেচ মাসি, তখন সেই ত সকলের চেয়ে ভাল হয়েচে। যে যতই বলুক না কেন, এতখানি বিষ জিভ দিয়ে ছড়াতে তোমার মত কেউ ত পেরে উঠত না।

মাসি এবং বেণী উভয়েই যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিলেন। মাসি রান্নাঘরের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, কি বললি লা?

কিছু না। আহ্নিক করতে বসে ত সাতবার উঠলে—যাও না, ওটা সেরে ফেল না—রান্নাবান্না কি হবে না? বলিতে বলিতে রমা নিজেও বাহির হইয়া আসিল এবং কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া বারান্দা পার হইয়া ওদিকের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বেণী শুষ্কমুখে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি মাসি?

কি করে জানব বাছা! ও রাজরাণীর মেজাজ বোঝা কি আমাদের মত দাসী-বাঁদীর কর্ম! বলিয়া ক্রোধে, ক্ষোভে তিনি মুখখানা কালিবর্ণ করিয়া তাঁহার পূজার আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং বোধ করি বা মনে মনে ভগবানের নাম করিতেই লাগিলেন। বেণী ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

॥ দুই ॥

এই কুঁয়াপুরের বিষয়টা অর্জিত হইবার একটু ইতিহাস আছে, তাহা এইখানে বলা আবশ্যক। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে মহাকুলীন বলরাম মুখুয্যে তাঁহার মিতা বলরাম ঘোষালকে সঙ্গে করিয়া বিক্রমপুর হইতে এদেশে আসেন। মুখুয্যে শুধু কুলীন ছিলেন না, বুদ্ধিমানও ছিলেন। বিবাহ করিয়া, বর্ধমান রাজ-সরকারের চাকরি করিয়া এবং আরও কি কি করিয়া, এই বিষয়টুকু হস্তগত করেন। ঘোষালও এই দিকেই বিবাহ করেন। কিন্তু পিতৃঋণ শোধ করা ভিন্ন আর তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না; তাই দুঃখে-কষ্টেই তাঁহার দিন কাটিতেছিল। এই বিবাহ

উপলক্ষ্যেই নাকি দুই মিতার মনোমালিন্য ঘটে। পরিশেষে তাহা এমন বিবাদে পরিণত হয় যে, এক গ্রামে বাস করিয়াও বিশ বৎসরের মধ্যে কেহ কাহারও মুখদর্শন করেন নাই। বলরাম মুখুয্যে যেদিন মারা গেলেন, সেদিনও ঘোষাল তাঁহার বাটীতে পা দিলেন না। কিন্তু তাঁহার মরণের পরদিন অতি আশ্চর্য কথা শুনা গেল, নিজেই সমস্ত বিষয় চুল-চিরিয়া অর্ধেক ভাগ করিয়া নিজের পুত্র ও মিতার পুত্রগণকে দিয়া গিয়াছেন। সেই অবধি কুঁয়াপুরের বিষয় মুখুয্যে ও ঘোষালবংশ ভোগদখল করিয়া আসিতেছে। ইঁহারা নিজেরাও জমিদার বলিয়া অভিমান করিতেন, গ্রামের লোকও অস্বীকার করিত না।

যখনকার কথা বলিতেছি তখন ঘোষালবংশও ভাগ হইয়াছিল। সেই বংশের ছোট তরফের তারিণী ঘোষাল মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে জেলায় গিয়া দিন-ছয়েক পূর্বে হঠাৎ যেদিন আদালতে ছোট-বড় পাঁচ-সাতটা মুলতুবি মোকদ্দমার শেষফলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কোথাকার কোন্ অজানা আদালতের মহামান্য শমন মাথায় করিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন, তখন তাঁহাদের কুঁয়াপুর গ্রামের ভিতরে ও বাহিরে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বড় তরফের কর্তা বেণী ঘোষাল খুড়োর মৃত্যুতে গোপনে আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন এবং আরো গোপনে দল পাকাইতে লাগিলেন কি করিয়া খুড়োর আগামী শ্রাদ্ধের দিনটা পণ্ড করিয়া দিবেন। দশ বৎসর খুড়ো-ভাইপোর মুখ দেখাদেখি ছিল না। বহু বৎসর পূর্বে তারিণীর গৃহ শূন্য হইয়াছিল। সেই অবধি পুত্র রমেশকে তাহার মামার বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া তারিণী বাড়ির ভিতরে দাস-দাসী এবং বাইরে মোকদ্দমা লইয়াই কাল কাটাইতেছিলেন। রমেশ রুড়কি কলেজে এই দুঃসংবাদ পাইয়া পিতার শেষকার্য সম্পন্ন করিতে সুদীর্ঘকাল পরে কাল অপরাহ্নে তাহার শূন্য গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

কর্মবাড়ি। মধ্যে শুধু দু'টা দিন বাকি। বৃহস্পতিবার রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধ। দুই-একজন করিয়া ভিন্ন গ্রামের মরুব্বিরা উপস্থিত হইতেছেন। কিন্তু নিজেদের কুঁয়াপুরের যে কেহ আসে না, রমেশ তাহা বুঝিয়াছিল এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত কেহ আসিবেই না তাহাও জানিত। শুধু ভৈরব আচার্য ও তাহার বাড়ির লোকেরা আসিয়া কাজ-কর্মে যোগ দিয়াছিল। স্বগ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগের পদধূলির আশা না থাকিলেও উদ্যোগ-আয়োজন রমেশ বড়লোকের মতই করিয়াছিল। আজ অনেকক্ষণ পর্যন্ত রমেশ বাড়ির ভিতরে কাজকর্মে ব্যস্ত ছিল। কি জন্য বাহিরে আসিতেই দেখিল, ইতিমধ্যে জন-দুই প্রাচীন ভদ্রলোক আসিয়া বৈঠকখানার বিছানায় সমাগত হইয়া ধূমপান করিতেছেন। সম্মুখে আসিয়া সবিনয়ে কিছু বলিবার পূর্বেই পিছনে শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল, এক অতিবৃদ্ধ পাঁচ-ছটি ছেলে মেয়ে লইয়া কাসিতে কাসিতে বাড়ি ঢুকিল। তাঁহার কাঁধে মলিন উত্তরীয়, নাকের উপর একজোড়া ভাঁটার মত মস্ত চশমা পিছনে দড়ি দিয়া বাঁধা। সাদা চুল, সাদা

গোঁফ তামাকের ধুঁয়ায় তাম্রবর্ণ। অগ্রসর হইয়া আসিয়া সে সেই ভীষণ চশমার ভিতর দিয়া রমেশের মুখের দিকে মুহূর্তকাল চাহিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। রমেশ চিনিল না ইনি কে, কিন্তু যেই হোন্‌ ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিতেই সে ভাঙ্গা গলায় বলিয়া উঠিল, না বাবা রমেশ, তারিণী যে এমন করে ফাঁকি দিয়ে পালাবে, তা স্বপ্নেও জানিনে, কিন্তু আমারও এমন চাটুয্যে বংশে জন্ম নয় যে, কারু ভয়ে মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বেরুবে। আসবার সময় তোমার বেণী ঘোষালের মুখের সামনে বলে এলুম, আমাদের রমেশ যেমন শ্রাদ্ধের আয়োজন করছে, এমন করা চুলোয় যাক, এ অঞ্চলে কেউ চোখেও দেখেনি। একটু থামিয়া বলিল, আমার নামে অনেক শালা অনেক রকম করে তোমার কাছে লাগিয়ে যাবে বাবা, কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো, এই ধর্মদাস শুধু ধর্মেরই দাস, আর কারো নয়। এই বলিয়া বৃদ্ধ সত্য ভাষণের সমস্ত পৌরুষ আত্মসাৎ করিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলীর হাত হইতে হুঁকাটা ছিনাইয়া লইয়া তাহাতে এক টান দিয়াই প্রবলবেগে কাসিয়া ফেলিল।

ধর্মদাস নিতান্ত অত্যুক্তি করেন নাই। উদ্যোগ-আয়োজন যেরূপ হইতেছিল, এদিকে সেরূপ কেহ করে নাই। কলিকাতা হইতে ময়রা আসিয়াছিল। তাহারা প্রাঙ্গণের একধারে ভিয়ান চড়াইয়াছে সেদিকে পাড়ার কতকগুলো ছেলেমেয়ে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে; কাঙ্গালীদের বস্ত্র দেওয়া হইবে চণ্ডীমণ্ডপের ও-ধারের বারান্দায় অনুগত ভৈরব আচার্য থান ফাড়িয়া পাট করিয়া গাদা করিতেছিল— সেদিকেও জনকয়েক লোক থাবা পাতিয়া বসিয়া এই অপব্যয়ের পরিমাণ হিসাব করিয়া মনে মনে রমেশের নির্বুদ্ধিতার জন্য তাহাকে গালি পাড়িতেছিল। গরীব-দুঃখী সংবাদ পাইয়া অনেক দূরের পথ হইতেও আসিয়া জুটিতেছিল। লোকজন, প্রজা-পাঠক বাড়ি পরিপূর্ণ করিয়া কেহ কলহ করিতেছিল, কেহ বা মিছিমিছি শুধু কোলাহল করিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া ধর্মদাসের কাসি আরও বাড়িয়া গেল।

প্রত্যুত্তরে রমেশ সঙ্কুচিত হইয়া 'না না' বলিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ধর্মদাস হাত নাড়িয়া থামাইয়া দিয়া ঘড়্‌ঘড়্‌ করিয়া কত কি বলিয়া ফেলিল, কিন্তু কাসির ধমকে তাহার একটি বর্ণও বুঝা গেল না।

গোবিন্দ গাঙ্গুলী সর্বাগ্রে আসিয়াছিল। সুতরাং ধর্মদাস যাহা বলিয়াছিল তাহা বলিবার সুবিধা তাহারই সর্বাপেক্ষা অধিক থাকিয়াও নষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া তাহার মনে মনে ভারি একটা ক্ষোভ জন্মিতেছিল। সে এ সুযোগ আর নষ্ট হইতে দিল না। ধর্মদাসকে উদ্দেশ করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কাল সকালে বুঝলে ধর্মদাসদা, এখানে আসব বলে বেরিয়েও আসা হ'ল না—বেণীর ডাকাডাকি—গোবিন্দখুড়ো, তামাক খেয়ে যাও। একবার ভাবলুম, কাজ নেই— তারপর মনে হ'ল ভাবখানা বেণীর দেখেই যাই না। বেণী কি বললে জান বাবা,

রমেশ ! বললে, খুড়ো, বলি তোমরা ত রমেশের মুরুব্বির হয়ে দাঁড়িয়েচ, কিন্তু জিজ্ঞেস করি, লোকজন খাবে-টাবে ত ? আমিই বা ছাড়ি কেন। তুমি বড়লোক আছ না আছ, আমার রমেশ কারো চেয়ে খাটো নয়। তোমার ঘরে ত এক মুঠো চিঁড়ের পিত্যেশ কারু নেই। বললুম বেণীবাবু, এই ত পথ, একবার কাঙ্গালী-বিদায়টা দাঁড়িয়ে দেখো। কালকের ছেলে রমেশ, কিন্তু বুকের পাটাও বলি একে ! এতটা বয়েস হ'ল, এমন আয়োজন কখনও চোখে দেখিনি। কিন্তু তাও বলি ধর্মদাসদা, আমাদের সাধ্যিই বা কি ! যাঁর কাজ তিনি উপর থেকে করাচ্চেন। তারিণীদা শাপভ্রষ্ট দিক্‌পাল ছিলেন বৈ ত নয় !

ধর্মদাসের কিছুতেই কাসি থামে না, সে কাসিতেই লাগিল, আর তাহার মুখের সামনে গাঙ্গুলীমশাই বেশ বেশ কথাগুলি অপরিপক্ক তরুণ জমিদারটিকে বলিয়া যাইতে লাগিল দেখিয়া ধর্মদাস আরও ভাল কিছু বলিবার চেষ্টায় যেন আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল।

গাঙ্গুলী বলিতে লাগিল, তুমি ত আমার পর নও বাবা—নিতান্ত আপনার। তোমার মা যে আমার একেবারে সাক্ষাৎ পিসতুতো বোনের খুড়তুতো ভগিনী। রাধানগরের বাঁড়ুয্যে বাড়ি—সে-সব তারিণীদা জানতেন ! তাই যে-কোন কাজ-কর্মে—মামলা-মোকদ্দমা করতে, সাক্ষী দিতে—ডাক গোবিন্দকে !

ধর্মদাস প্রাণপণ-বলে কাসি থামাইয়া খিঁচাইয়া উঠিল—কেন. বাজে বকিস গোবিন্দ ? থক্‌- থক্‌ -থক্‌—আমি আজকের নই—না জানি কি ? সে বছর সাক্ষী দেবার কথায় বল্‌লি, আমার জুতো নেই, খালি-পায়ে যাই কি করে ? থক্‌ -থক্‌—তারিণী অমনি আড়াই টাকা দিয়ে একজোড়া জুতো কিনে দিল। তুই সেই পায়ে দিয়ে বেণীর হয়ে সাক্ষী দিয়ে এলি ! থক্‌—থক্‌—থক্‌—

গোবিন্দ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল, এলুম ?

এলিনে ?

দূর মিথ্যাবাদী।

মিথ্যাবাদী তোর বাবা।

গোবিন্দ তাহার ভাঙ্গা ছাতি হাতে করিয়া লাফাইয়া উঠিল, তবে রে শালা !

ধর্মদাস তাহার বাঁশের লাঠি উঁচাইয়া হুঙ্কার দিয়াই প্রচণ্ডভাবে কাঁসিয়া ফেলিল। রমেশ শশব্যস্তে উভয়ের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। ধর্মদাস লাঠি নামাইয়া কাসিতে কাসিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, ও শালার সম্পর্কে আমি বড় ভাই হয় কিনা, তাই শালার আক্কেল দেখ—

ওঃ, শালা আমার বড় ভাই ! বলিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলীও ছাতি গুটাইয়া বসিয়া পড়িল।

শহরের ময়রারা ভিয়ান ছাড়িয়া চাহিয়া রহিল। চতুর্দিকে যাহারা কাজ-কর্মে নিযুক্ত ছিল, চেঁচামেচি শুনিয়া তাহারা তামাশা দেখিবার জন্য সুমুখে ছুটিয়া

আসিল। ছেলেমেয়েরা খেলা ফেলিয়া হাঁ করিয়া মজা দেখিতে লাগিল এবং এই-সমস্ত লোকের দৃষ্টির সম্মুখে রমেশ লজ্জায় বিস্ময়ে হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। কি এ? উভয়েই প্রাচীন, ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ-সন্তান! এত সামান্য কারণে এমন ইতরের মত গালিগালাজ করিতে পারে! বারান্দায় বসিয়া ভৈরব কাপড়ের থাক দিতে দিতে সমস্তই দেখিতেছিল, শুনিতেছিল। এখন উঠিয়া আসিয়া রমেশকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, প্রায় শ' চারেক কাপড় ত হ'ল, আরও চাই কি?

রমেশের মুখ দিয়া হঠাৎ কথাই বাহির হইল না। ভৈরব রমেশের অভিভূত ভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিল। মৃদু অনুযোগের স্বরে কহিল, ছিঃ গাঙ্গুলীমশাই! বাবু একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। আপনি কিছু মনে করবেন না বাবু, এমন ঢের হয়। বৃহৎ কাজ-কর্মের বাড়িতে কত ঠেঙ্গাঠেঙ্গি রক্তারক্তি পর্যন্ত হয়ে যায় আবার যে-কে সেই হয়। নিন্ উঠুন চাটুয্যেমশাই—দেখুন দেখি আরও থান ফাড়ব কি না?

ধর্মদাস জবাব দিবার পূর্বেই গোবিন্দ গাঙ্গুলী সোৎসাহে শিরশ্চালনপূর্বক খাড়া হইয়া বলিল, হয়ই ত? হয়ই ত! ঢের হয়! নইলে বিরদ কর্ম বলেচে কেন? শাস্তরে আছে লক্ষ কথা না হলে বিয়েই হয় না যে! সে বছর তোমার মনে আছে ভৈরব, যদু মুখুয্যেমশায়ের কন্যা রমার গাছ পিতিষ্ঠের দিনে সিদে নিয়ে রাঘব ভট্চাযিতে হারাণ চাটুয্যেতে মাথা-ফাটাফাটি হয়ে গেল? কিন্তু আমি বলি ভৈরবভায়া, বাবাজীর এ কাজটা ভাল হচ্ছে না। ছোটলোকদের কাপড় দেওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা এক কথা। তার চেয়ে বামুনদের একজোড়া, আর ছেলেদের একখানা ক'রে দিলেই নাম হ'ত। আমি বলি বাবাজী, সেই যুক্তিই করুন, কি বল ধর্মদাসদা?

ধর্মদাস ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, গোবিন্দ মন্দ কথা বলেনি, বাবাজী! ও ব্যাটাদের হাজার দিলেও নাম হবার যো নেই। নইলে আর ওদের ছোটলোক বলেচে কেন? বুঝলে না বাবা রমেশ

এখন পর্যন্ত রমেশ নিঃশব্দে ছিল। এই বস্ত্র-বিতরণের আলোচনায় সে একেবারে যেন মনমরা হইয়া পড়িল। ইহার সুযুক্তি-কুযুক্তি সম্বন্ধে নহে, এখন এইটাই তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক বাজিল যে, ইহারা যাহাদিগকে ছোটলোক বলিয়া ডাকে, তাহাদেরই সহস্র চক্ষুর সম্মুখে এইমাত্র যে এতবড় একটা লজ্জাকর কাণ্ড করিয়া বসিল, সেজন্য ইহাদের কাহারও মনে এতটুকু ক্ষোভ বা লজ্জার কণামাত্রও নাই। ভৈরব মুখপানে চাহিয়া আছে দেখিয়া রমেশ সংক্ষেপে কহিল, আরও দু শ' কাপড় ঠিক করে রাখুন।

তা নইলে কি হয়? ভৈরবভায়া, চল, আমিও যাই—তুমি একা আর কত পারবে বল? বলিয়া কাহারও সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া গোবিন্দ উঠিয়া

বস্ত্ররাশির নিকটে গিয়া বসিলেন। রমেশ বাটীর ভিতর যাইবার উপক্রম করিতেই ধর্মদাস তাহাকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া চুপিচুপি অনেক কথা কহিলেন। রমেশ প্রত্যুত্তরে মাথা নাড়িয়া সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। কাপড় গুছাইতে গুছাইতে গোবিন্দ গাঙ্গুলী আড়চোখে সব দেখিল।

কৈ গো, বাবাজী কোথায় গো? বলিয়া একটি শীর্ণকায় মুণ্ডিতশ্মশ্রু প্রাচীন ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিল। ইহার সঙ্গেও গুটি-তিনেক ছেলেমেয়ে। মেয়েটি সকলের বড়। তাহারই পরনে শুধু একখানি অতি জীর্ণ ডুরে-কাপড়। বালক-দু'টি কোমরে এক-একগাছি ঘুনসি ব্যতীত একেবারে দিগম্বর। উপস্থিত সকলেই মুখ তুলিয়া চাহিল। গোবিন্দ অভ্যর্থনা করিল, এস দীনুদা, ব'সো। বড় ভাগ্যি আমাদের যে আজ তোমার পায়ের ধুলো পড়ল। ছেলেটা একা সারা হয়ে যায়, তা তোমরা -

ধর্মদাস গোবিন্দের প্রতি কট্‌মট করিয়া চাহিল। সে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া কহিল, তা তোমরা ত কেউ এদিক মাড়াবে না দাদা—বলিয়া তাহার হাতে হুঁকাটা তুলিয়া দিল। দীনু ভট্‌চায আসন গ্রহণ করিয়া দগ্ধ হুঁকাটায় নিরর্থক খোটা-দুই টান দিয়া বলিল আমি ত ছিলাম না ভায়া—তোমার বৌঠাকরুনকে আনতে তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলুম। বাবাজী কোথায়? শুনচি নাকি ভারী আয়োজন হচ্চে? পথে আসতে ও-গাঁয়ের হাটে শুনে এলুম খাইয়ে-দাইয়ে ছেলে-বুড়োর হাতে ষোলখানা করে লুচি আর চার-জোড়া করে সন্দেশ দেওয়া হবে।

গোবিন্দ গলা খাটো করিয়া কহিল, তা ছাড়া হয়ত একখানা করে কাপড়ও। এই যে রমেশ বাবাজী, তাই দীনুদাকে বলছিলুম বাবাজী,—তোমাদের পাঁচজনের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে যোগাড়-সোগাড় একরকম করা ত যাচ্ছে, কিন্তু বেণী একেবারে উঠে পড়ে লেগেচে। এই আমার কাছেই দুবার লোক পাঠিয়েচে। তা আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলে, রমেশের সঙ্গে আমার যেন নাড়ির টান রয়েছে কিন্তু এই যে দীনুদা, ধর্মদাসদা, এঁরাই কি বাবা তোমাকে ফেলতে পারবেন? দীনুদা ত পথ থেকে শুনতে পেয়ে ছুটে আসচেন। ওরে ও ষষ্ঠিচরণ, তামাক দে না রে! বাবা রমেশ, একবার এদিকে এস দেখি, একটা কথা বলে নিই! নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গোবিন্দ ফিস্‌ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভিতরে বুঝি ধর্মদাস-গিন্নী এসেচে? খবরদার, খবরদার, অমন কাজটি ক'রো না বাবা! বিট্‌লে বামুন যতই ফোসলাক্, ধর্মদাস-গিন্নীর হাতে ভাঁড়ারের চাবি-টাবি দিও না বাবা, কিছুতে দিও না—ঘি, ময়দা, তেল, নুন অর্ধেক সরিয়ে ফেলবে। তোমার ভাবনা কি বাবা? আমি গিয়ে তোমার মামীকে পাঠিয়ে দেব। সে এসে ভাঁড়ারের ভার নেবে, তোমার একগাছি কুটো পর্যন্ত লোকসান হবে না।

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মৌন হইয়া রহিল। তাহার বিস্ময়ের অবধি নাই! ধর্মদাস যে তাহার গৃহিণীকে ভাঁড়ারের ভার লইবার জন্য পাঠাইয়া

দিবার কথা এত গোপনে কহিয়াছিল, গোবিন্দ ঠিক তাহাই আন্দাজ করিয়াছিল কিরূপে ?

উলঙ্গ শিশু-দুটা ছুটিয়া আসিয়া দীনুদার কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িল—বাবা, সন্দেশ খাব।

দীনু একবার রমেশের প্রতি একবার গোবিন্দের প্রতি চাহিয়া কহিল, সন্দেশ কোথায় পাব রে ?

কেন, ঐ যে হুচ্চে, বলিয়া তাহারা ওদিকের ময়রাদের দেখাইয়া দিল।

আমরাও দাদামশাই, বলিয়া নাকে কাঁদিতে কাঁদিতে আরও তিন-চারটি ছেলেমেয়ে ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ ধর্মদাসকে ঘিরিয়া ধরিল।

বেশ ত, বেশ ত, বলিয়া রমেশ ব্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল -ও আচার্যিমশাই, বিকেলবেলায় ছেলেরা সব বাড়ি থেকে বেরিয়েচে, খেয়ে ত আসেনি—ওহে ও, কি নাম তোমার ? নিয়ে এস ত ঐ থালাটা এদিকে।

ময়রা সন্দেশের থালা লইয়া আসিবামাত্র ছেলেরা উপুড় হইয়া পড়িল ; বাঁটিয়া দিবার অবকাশ দেয় না এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিল। ছেলেদের খাওয়া দেখিতে দেখিতে দীননাথের শুষ্কদৃষ্টি সজল ও তীব্র হইয়া উঠিল—ওরে ও খেঁদি, খাচ্ছিস ত, সন্দেশ হয়েচে কেমন বল দেখি ?

বেশ বাবা, বলিয়া খেঁদি চিবাইতে লাগিল। দীনু মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ তোদের আবার পছন্দ! মিষ্টি হলেই হ'ল ' হাঁ হে কারিগর, এ কড়াটা কেমন নামালে—কি বল গোবিন্দভায়া, এখনও একটু রোদ আছে বলে মনে হচ্ছে না ?

ময়রা কোন দিকে না চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ কহিল, আজ্ঞে আছে বৈ কি ! এখনো ঢের বেলা আছে, এখনো সন্ধ্যে-আহ্নিকের—

তবে কৈ দাও দেখি একটা গোবিন্দভায়াকে, চেখে দেখুক কেমন কলকাতার কারিগর তোমরা ! না, না, আমাকে আবার কেন ? তবে আধখানা আধখানার বেশী নয়। ওরে ষষ্ঠীচরণ, একটু জল আন্ দিকি বাবা, হাতটা ধুয়ে ফেলি—

রমেশ ডাকিয়া বলিয়া দিল, অমনি বাড়ির ভিতর থেকে গোটাচারেক থালাও নিয়ে আসিস ষষ্ঠীচরণ।

প্রভুর আদেশ মত ভিতর হইতে গোটা তিনেক রেকাবি ও জলের গেলাস আসিল এবং দেখিতে দেখিতে এই বৃহৎ থালার অর্ধেক মিষ্টান্ন এই তিন প্রাচীন ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট সদ্‌ব্রাহ্মণের জলযোগে নিঃশেষিত হইয়া গেল।

হাঁ, কলকাতার কারিগর বটে ! কি বল ধর্মদাসদা ? বলিয়া দীননাথ রুদ্ধনিশ্বাস ত্যাগ করিল। ধর্মদাসদার তখনও শেষ হয় নাই, এবং যদিচ তাঁহার অব্যক্ত কণ্ঠস্বর সন্দেশের তাল ভেদ করিয়া সহজে মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিল না, তথাপি বোঝা গেল এ বিষয়ে তাহার মতভেদ নাই।

হাঁ ওস্তাদি হাত বটে। বলিয়া গোবিন্দ সকলের শেষে হাত ধুইবার উপক্রম করিতেই ময়রা সবিনয়ে অনুরোধ করিল, যদি কষ্টই করলেন ঠাকুরমশাই, তবে মিহিদানাটা একটু পরখ করে দিন।

মিহিদানা? কৈ আনো দেখি বাপু?

মিহিদানা আসিল এবং এতগুলি সন্দেশের পরে এই নূতন বস্তুটির সদ্ব্যবহার দেখিয়া রমেশ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল! দীননাথ মেয়ের প্রতি হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিল, ওরে ও খেঁদি, ধর্ দিকি মা এই দুটো মিহিদানা।

আমি আর খেতে পারব না বাবা।

পারবি, পারবি। এক ঢোক জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নে দিকি, মুখ মেরে গেছে বৈ ত নয়! না পারিস্ আঁচলে একটা গেরো দিয়ে রাখ, কাল সকালে খাস্, হাঁ বাপু, খাওয়ালে বটে! যেন অমৃত! তা বেশ হয়েচে। মিষ্টি বুঝি দুরকম করলে বাবাজী!

রমেশকে বলিতে হইল না। ময়রা সোৎসাহে কহিল, আজ্ঞে না, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন—

অ্যাঁ ক্ষীরমোহন! কৈ সে ত বার করলে না বাপু?

বিস্মিত রমেশের মুখের পানে চাহিয়া দীননাথ কহিল, খেয়েছিলুম বটে রাধানগরের বোসেদের বাড়িতে। আজও যেন মুখে লেগে রয়েচে। বললে বিশ্বাস করবে না বাবাজী, ক্ষীরমোহন খেতে আমি বড্ড ভালোবাসি।

রমেশ হাসিয়া একটুখানি ঘাড় নাড়িল। কথাটা বিশ্বাস করা তাহার কাছে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইল না। রাখাল কি কাজে বাহিরে যাইতেছিল, রমেশ তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ভেতরে বোধ করি আচার্য্যিমশাই আছেন; যা ত রাখাল কিছু ক্ষীরমোহন তাঁকে আনতে বলে আয় দেখি।

সন্ধ্যা বোধ করি উত্তীর্ণ হইয়াছে। তথাপি ব্রাহ্মণেরা ক্ষীরমোহনের আশায় উৎসুক হইয়া বসিয়া আছেন। রাখাল ফিরিয়া বলিল, আজ আর ভাঁড়ারের চাবি খোলা হবে না বাবু।

রমেশ মনে মনে বিরক্ত হইল। কহিল, বল গে, আমি আনতে বলচি।

গোবিন্দ গাঙ্গুলী রমেশের অসন্তোষ লক্ষ্য করিয়া চোখ ঘুরাইয়া কহিল, দেখলে দীনুদা, ভৈরবের আক্কেল? এ যে দেখি মায়ের চেয়ে মাসির বেশি দরদ। সেই জন্যই আমি বলি—

সে কি বলে তাহা না শুনিয়া রাখাল বলিয়া উঠিল, আচার্য্যিমশাই কি করবেন? ও-বাড়ি থেকে গিন্নীমা এসে ভাঁড়ার বন্ধ করেছেন যে!

ধর্মদাস এবং গোবিন্দ উভয়ে চমকিয়া উঠিল, কে, বড়গিন্নী?

রমেশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, জ্যাঠাইমা এসেছেন?

আজ্ঞে হাঁ, তিনি এসেই ছোট-বড় দুই ভাঁড়ারই তালাবন্ধ করে ফেলেছেন।

বিস্ময়ে আনন্দে রমেশ দ্বিতীয় কথাটি না বলিয়া দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল।

॥ তিন ॥

জ্যাঠাইমা!

ডাক শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী ভাঁড়ার ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। বেণীর বয়সের সঙ্গে তুলনা করিলে তাহার জননীর বয়স পঞ্চাশের কম হওরা উচিত নয়, কিন্তু দেখিলে কিছুতেই চল্লিশের বেশি বলিয়া মনে হয় না।

রমেশ নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া রহিল। আজও সেই কাঁচা সোনার বর্ণ। একদিন যে রূপের খ্যাতি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল, আজও সেই অনিন্দ্য সৌন্দর্য তাঁহার নিটোল পরিপূর্ণ দেহটিকে বর্জন করিয়া দূরে যাইতে পারে নাই। মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা, সুমুখেই দুই-একগাছি কুঞ্চিত হইয়া কপালের উপর পড়িয়াছে। চিবুক, কপাল, ওষ্ঠাধর, ললাট সবগুলি যেন কোন বড় শিল্পীর বহু যত্নের বহু সাধনার ফল। সবচেয়ে আশ্চর্য তাঁহার দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি। সেদিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিলে সমস্ত অন্তঃকরণ যেন মোহাবিষ্ট হইয়া আসিতে থাকে।

এই জ্যাঠাইমা রমেশকে এবং বিশেষ করিয়া তাহার পরলোকগতা জননীকে এক সময় বড় ভালবাসিতেন। বধূ-বয়সে যখন ছেলেরা হয় নাই—শাশুড়ি-ননদের যন্ত্রণায় লুকাইয়া বসিয়া এই দুটি জায়ে যখন একযোগে চোখের জল ফেলিতেন—তখন এই স্নেহের প্রথম গ্রন্থিবন্ধন হয়। তার পরে, গৃহবিচ্ছেদ, মামলা-মোকদ্দমা, পৃথক হওয়া, কত রকমের ঝড়-ঝাপটা এই দুইটি সংসারের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, বিবাদের উত্তাপে বাঁধন শিথিল হইয়াছে, কিন্তু একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই। বহুবর্ষ পরে সেই ছোটবৌয়ের ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া তাহারই হাতে সাজানো এই-সমস্ত বহু পুরাতন হাঁড়ি-কলসির পানে চাহিয়া জ্যাঠাইমার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। রমেশের আহ্বানে যখন তিনি চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, তখন সেই দুটি আরক্ত আর্দ্র চক্ষু-পল্লবের পানে চাহিয়া রমেশ ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল। জ্যাঠাইমা তাহা টের পাইলেন। তাহাতেই বোধ করি, এই সদ্য-পিতৃহীন রমেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই তাঁহার বুকের ভিতরটা যেভাবে হাহাকার করিয়া উঠিল, তাহার লেশমাত্র তিনি বাইরে প্রকাশ পাইতে দিলেন না। বরং একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, চিনতে পারিস রমেশ?

জবাব দিতে গিয়া রমেশের ঠোঁট কাঁপিয়া গেল। মা মারা গেলে যতদিন না মামার বাড়ি গিয়াছিল, ততদিন এই জ্যাঠাইমা তাহাকে বুকে করিয়া রাখিয়াছিলেন

এবং কিছুতেই ছাড়িতে চাহেন নাই। সে-ও মনে পড়িল এবং এ-ও মনে হইল সেদিন ও-বাড়িতে গেলে জ্যাঠাইমা বাড়ি নাই বলিয়া দেখা পর্যন্ত করেন নাই। তার পর রমাদের বাড়িতে বেণীর সাক্ষাতে এবং অসাক্ষাতে তাহার মাসির নিরতিশয় কঠিন তিরস্কারে সে নিশ্চয় বুঝিয়া আসিয়াছিল, এ গ্রামে আপনার বলিতে তাহার আর কেহ নাই। বিশ্বেশ্বরী রমেশের মুখের প্রতি মুহূর্তকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ছি বাবা এ সময়ে শক্ত হ'তে হয়।

তাঁহার কণ্ঠস্বরে কোমলতার আভাসমাত্র যেন ছিল না। রমেশ নিজেকে সামলাইয়া ফেলিল। সে বুঝিল যেখানে অভিমানের কোন মর্যাদা নাই, সেখানে অভিমান প্রকাশ পাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে অল্পই আছে। কহিল, শক্ত আমি হয়েচি জ্যাঠাইমা! তাই যা পারতুম নিজেই করতুম, কেন তুমি আবার এলে?

জ্যাঠাইমা হাসিলেন। কহিলেন, তুই ত আমাকে ডেকে আনিস নি রমেশ, যে, তোকে তার কৈফিয়ত দেব? তা শোন বলি। কাজ-কর্ম হবার আগে আর আমি ভাঁড়ার থেকে খাবার-টাবার কোন জিনিস বা'র হতে দেব না; যাবার সময় ভাঁড়ারের চাবি তোর হাতেই দিয়ে যাব, আবার কাল এসে তোর হাত থেকেই নেব। আর কারু হাতে দিস্‌নি যেন। হাঁ রে, সেদিন তোর বড়দার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

প্রশ্ন শুনিয়া রমেশ দ্বিধায় পড়িল। সে ঠিক বুঝিতে পারিল না, তিনি পুত্রের ব্যবহার জানেন কি না। ভাবিয়া কহিল, বড়দা তখন ত বাড়ি ছিলেন না।

প্রশ্ন করিয়াই জ্যাঠাইমার মুখের উপর একটা উদ্বেগের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল; রমেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার এই কথায় সেই ভাবটা যেন কাটিয়া গিয়া মুখখানি প্রসন্ন হইয়া উঠিল। হাসিমুখে সস্নেহে অনুযোগের কণ্ঠে বলিলেন, আ আমার কপাল! এই বুঝি? হাঁ রে, দেখা হয়নি বলে আর যেতে নেই? আমি জানি রে, সে তোদের উপর সন্তুষ্ট নয়; কিন্তু তোর কাজ ত তোর করা চাই। যা একবার ভ'ল করে বল গে যা রমেশ! সে বড় ভাই, তার কাছে হেঁট হ'তে তোর কোন লজ্জা নেই। তা ছাড়া এটা মানুষের এমনি দুঃসময় বাবা যে, কোন লোকের হাতে পায়ে ধরে মিটমাট করে নিতেও লজ্জা নেই। লক্ষ্মীমানিক আমার, যা একবার এখন বোধ হয় সে বাড়িতে আছে।

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। এই আগ্রহাতিশয্যের হেতুও তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইল না, মন হইতে সংশয়ও ঘুচিল না। বিশ্বেশ্বরী আরও কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, বাইরে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের আমি তোর চেয়ে ঢের বেশি জানি। তাঁদের কথা শুনিস্ নে। আয় আমার সঙ্গে, তোর বড়দার কাছে একবার যাবি চল।

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না জ্যাঠাইমা, সে হয় না। আর বাইরে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা যাই হোন তাঁরাই আমার সকলের চেয়ে আপনার।

সে আরও কি কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ জ্যাঠাইমার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সে মহাবিস্ময়ে চুপ করিল। তাহার মনে হইল, জ্যাঠাইমার মুখখানি যেন সহসা চারিদিকের সন্ধ্যার চেয়েও বেশি মলিন হইয়া গেল। খানিক পরে তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তবে তাই। যখন তার কাছে যাওয়া হতেই পারবে না, তখন আর সে নিয়ে কথা কয়ে কি হবে। যা হোক, তুই কিছু ভাবিস নি বাবা, কিছুই আটকাবে না। আমি আবার খুব ভোরেই আসবো। বলিয়া বিশ্বেশ্বরী তাঁহার দাসীকে ডাকিয়া লইয়া খিড়কির দ্বার দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন; বেণীর সহিত রমেশের ইতিমধ্যে দেখা হইয়া যে একটা কিছু হইয়া গিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিলেন। তিনি যে পথে গেলেন, সেই দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া রমেশ ম্লানমুখে যখন বাহিরে আসিল, তখন গোবিন্দ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবাজী, বড়গিন্নী এসেছিলেন, না?

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

শুনলুম ভাঁড়ার বন্ধ করে চাবি নিয়ে গেলেন, না?

রমেশ তেমনি মাথা নাড়িয়া জবাব দিল। কারণ, অবশেষে কি মনে করিয়া তিনি যাইবার সময় ভাঁড়ারের চাবি নিজেই লইয়া গিয়াছিলেন।

গোবিন্দ কহিল, দেখলে ধর্মদাসদা, যা বলেচি তাই। বলি মতলবটা বুঝলে বাবাজী?

রমেশ মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু নিজের নিরুপায় অবস্থা স্মরণ করিয়া সহ্য করিয়া চুপ করিয়া রহিল। দরিদ্র দীনু ভট্চায তখনও যায় নাই। কারণ তাহার বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল না। ছেলেমেয়ে লইয়া যাহার দয়ায় পেট ভরিয়া সন্দেশ খাইতে পাইয়াছিল, তাহাকে আন্তরিক দুটা আশীর্বাদ না করিয়া, সকলের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে তাহার সাত-পুরুষের স্তব-স্তুতি না করিয়া আর ঘরে ফিরিতে পারিতেছিল না। সে ব্রাহ্মণ নিরীহভাবে বলিয়া ফেলিল, এ মতলব বোঝা আর শক্ত কি ভায়া? তালাবন্ধ করে চাবি নিয়ে গেছেন, তার মানে ভাঁড়ার আর কারো হাতে না পড়ে। তিনি সমস্তই ত জানেন।

গোবিন্দ বিরক্ত হইয়াছিল; নির্বোধের কথায় জ্বলিয়া উঠিয়া তাহাকে একটা ধমক দিয়া কহিল, বোঝো না সোঝো না, তুমি কথা কও কেন বল ত? তুমি এ-সব ব্যাপারের কি বোঝো যে মানে করতে এসেচ?

ধমক খাইয়া দীনুর নির্বুদ্ধিতা আরও বাড়িয়া গেল। সেও উষ্ণ হইয়া জবাব দিল, আরে এতে বোঝাবুঝিটা আছে কোনখানে? শুনচ না, গিন্নীমা স্বয়ং এসে ভাঁড়ার বন্ধ করে চাবি নিয়ে গেছেন? এতে কথা কইবে আবার কে?
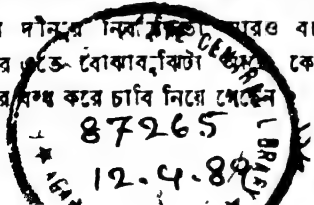
গোবিন্দ আগুন হইয়া কহিল, ঘরে যাও না ভট্চায। যে জন্যে ছুটে এসেছিলে—গুষ্টিবর্গ মিলে খেলে, বাঁধলে, আর কেন? ক্ষীরমোহন পরশু খেও, আজ আর হবে না। এখন যাও আমাদের ঢের কাজ আছে।

দীনু লজ্জিত ও সংকুচিত হইয়া পড়িল। রমেশ ততোধিক কুণ্ঠিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। গোবিন্দ আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা রমেশের শান্ত অথচ কঠিন কণ্ঠস্বরে থামিয়া গেল—আপনার হ'ল কি গাঙ্গুলীমশাই? যাকে-তাকে এমন খামকা অপমান করচেন কেন?

গোবিন্দ ভৎর্সিত হইয়া প্রথমটা বিস্মিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, অপমান আবার কাকে করলুম বাবাজী? ভাল, ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ না সত্যি কথাটি বলেচি কি না? ও ডালে ডালে বেড়ায় ত আমি পাতায় পাতায় ফিরি যে। দেখলে ধর্মদাসদা, দীনে বামনার আস্পর্ধা? আচ্ছা—

ধর্মদাসদা কি দেখিল তা সেই জানে, কিন্তু রমেশ লোকটার নির্লজ্জতা ও স্পর্ধা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তখন দীনু রমেশের দিকে চাহিয়া নিজেই বলিল, না বাবা, গোবিন্দ সত্য কথাই বলেচে। আমি বড় গরীব, সে কথা সবাই জানে। ওঁদের মত আমার জমি-জমা-চাষ-বাস কিছুই নেই। একরকম চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে-সিক্ষে করেই আমাদের দিন চলে। ভাল জিনিস ছেলে-পিলেদের কিনে খাওয়াবার ক্ষমতা ত ভগবান দেননি—তাই বড় ঘরে কাজকর্ম হলে ওরা খেয়ে বাঁচে। কিছু মনে ক'রো না বাবা, তারিণীদাদা বেঁচে থাকতে তিনি আমাদের খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন। তাই, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি বাবা, আমরা যে আশ মিটিয়ে খেয়ে গেলুম, তিনি ওপর থেকে দেখে খুশিই হয়েচেন।

হঠাৎ দীনুর গম্ভীর শুষ্ক চোখ-দুটো জলে ভরিয়া উঠিয়া টপ টপ্ করিয়া দু'ফোটা সকলের সুমুখেই ঝরিয়া প'ড়িল। রমেশ মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইল। দীনু তাহার মলিন ও শতচ্ছিন্ন উত্তরীয় প্রান্তে অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, শুধু আমিই নই বাবা। এদিকে আমার মত দুঃখী-গরীব যে যেখানে আছে, তারিণীদার কাছে হাত পেতে কেউ কখনো অমনি ফেরেনি। সে-কথা কে আর জানে বল? তাঁর ডান হাতের দান বাঁ হাতটাও টের পেত না যে। আর তোমাদের জ্বালাতন করব না। নে মা খেঁদি ওঠ, হরিধন চল্ বাবা ঘরে যাই, আবার কাল সকালে আসব, আর কি বলব বাবা রমেশ, বাপের মত হও, দীর্ঘজীবী হও।

রমেশ তাহার সঙ্গে আসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, ভট্চাযিমশাই, এই দু'টো-তিনটে দিন আমার ওপর দয়া রাখবেন। আর বলতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু এ বাড়িতে হরিধনের মায়ের ধুলো পড়ে ত ভাগ্য বলে মনে করব।

ভটচাযিমশায় ব্যস্ত হইয়া নিজের দুই হাতের মধ্যে রমেশের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, আমি বড় দুঃখী বাবা রমেশ আমাকে এমন করে বললে যে লজ্জায় মরে যাই।

ছেলেমেয়ে সঙ্গে করিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। রমেশ ফিরিয়া আসিয়া মুহূর্তের জন্য নিজের রূঢ় কথা স্মরণ করিয়া গাঙ্গুলীমশায়কে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেই সে থামাইয়া দিয়া উদ্দীপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, এ যে আমার নিজের কাজ রমেশ, তুমি না ডাকলেও যে আমাকে নিজে এসেই সমস্ত করতে হ'ত। তাই ত এসেচি; ধর্মদাসদা আর আমি দুই ভায়ে ত তোমার ডাকবার অপেক্ষা রাখিনি বাবা।

ধর্মদাস এইমাত্র তামাক খাইয়া কাসিতেছিল। লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কাসির দমকে চোখ-মুখ রাঙ্গা করিয়া হাত ঘুরাইয়া বলিল, বলি শোন রমেশ, আমরা বেণী ঘোষাল নই। আমাদের সম্বন্ধ ঠিক আছে।

তাহার কুৎসিত কথায় রমেশ চমকিয়া উঠিল; কিন্তু রাগ করিল না। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সে বুঝিয়াছিল, ইহারা শিক্ষা ও অভ্যাসের দোষে অসঙ্কোচে কতবড় গর্হিত কথা যে উচ্চারণ করে, তাহা জানেও না।

জ্যাঠাইমার সস্নেহ অনুরোধে এবং তাঁহার পরিশ্রান্ত মুখ মনে করিয়া রমেশ ভিতরে ভিতরে পীড়া অনুভব করিতেছিল। সকলে প্রস্থান করিলে সে বড়দার কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বেণীর চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি আটটা। ভিতরে যেন একটা লড়াই চলিতেছে। গোবিন্দ গাঙ্গুলীর হাঁকা-হাঁকিটাই সবচেয়ে বেশি। বাহির হইতেই তাহার কানে গেল, গোবিন্দ বাজি রাখিয়া বলিতেছে, এ যদি না দু'দিনে উচ্ছন্ন যায় ত আমার গোবিন্দ গাঙ্গুলী নাম তোমরা বদলে রেখো বেণীবাবু। নবাবী কাণ্ডকারখানা শুনেচ ত? ভাবিলাম ঘোষাল কিছু পয়সা রেখে মরেচে, তা ত জানি, তবে এত কেন? হাতে থাকে কর, না থাকে বিষয় বন্ধক দিয়ে কে করে ধার ক'রে বাপের শ্রাদ্ধ করে, তা ত কখন শুনিনি বাবা। আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি বেণীমাধববাবু, এ ছোঁড়া নন্দীদের গদি থেকে অন্ততঃ তিনটি হাজার টাকা দেনা করেচে।

বেণী উৎসাহিত হইয়া কহিল, তা হলে কথাটা ত বা'র করে নিতে হচ্ছে গোবিন্দখুড়ো?

গোবিন্দ স্বর মৃদু করিয়া কহিল, সবুর কর না বাবাজী। একবার ভাল করে ঢুকতেই দাও না তার পরে বাইরে দাঁড়িয়ে কে ও? এ কি রমেশ বাবাজী? আমরা থাকতে এত রাত্তিরে তুমি কেন বাবা?

রমেশ সে কথার জবাব না দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, বড়দা, আপনার কাছেই এলাম।

বেণী থতমত খাইয়া জবাব দিতে পারিল না। গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ কহিল, আসবে বৈ কি বাবা, একুশ' বার আসবে! এ ত তোমারই বাড়ি। আর বড়ভাই পিতৃতুল্য! তাই ত আমরা বেণীবাবুকে বলতে এসেছি, বেণীবাবু, তারিণীদার সঙ্গে মনোমালিন্য তাঁর সঙ্গেই যাক—আর কেন? তোমরা দু'ভাই এক হও, আমরা দেখে চোখ জুড়োই—কি বল হালদারমামা? ও কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে বাবা—কে আছিস রে, একখানা কম্বলের আসন-টাসন পেতে দে না রে! না বেণীবাবু, তুমি বড়ভাই—তুমিই সব। তুমি আলাদা হয়ে থাকলে চলবে না। তা ছাড়া বড়গিন্নীঠাকরুন যখন স্বয়ং গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, তখন—

বেণী চমকাইয়া উঠিল—মা গিয়েছিলেন?

এই চমকটা লক্ষ্য করিয়া গোবিন্দ মনে মনে খুশি হইল। কিন্তু বাহিরে সে ভাব গোপন করিয়া নিতান্ত ভালমানুষের মত খবরটা ফলাও করিয়া বলিতে লাগিল, শুধু যাওয়া কেন, ভাঁড়ার-টাঁড়ার—করা-কর্ম যা কিছু তিনিই ত করচেন। আর তিনি না করলে করবেই বা কে?

সকলেই চুপ করিয়া রহিল। গোবিন্দ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, নাঃ—গাঁয়ের মধ্যে বড়গিন্নীঠাকরুনের মত মানুষ কি আর আছে? না হবে কেন? না বেণীবাবু, সামনে বললে খোশামোদ করা হবে, কিন্তু যে যাই বলুক, গাঁয়ে যদি লক্ষ্মী থাকেন ত সে তোমার মা। এমন মা কি কারু হয়? বলিয়া পুনশ্চ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন। বেণী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া অস্ফুটে কহিল, আচ্ছা—

গোবিন্দ চাপিয়া ধরিল, শুধু আচ্ছা নয়, বেণীবাবু! যেতে হবে, করতে হবে, সমস্ত ভার তোমার উপরে। ভাল কথা, সবাই আপনারা ত উপস্থিত আছেন, নেমন্তন্নটা কি রকম করা হবে একটা ফর্দ করে ফেলা হোক না কেন? কি বল রমেশ বাবাজী? ঠিক কথা কিনা হালদারমামা? ধর্মদাসদা চুপ করে রইলে কেন? কাকে বলতে হবে, কাকে বাদ দিতে হবে জান ত সব।

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহজ-বিনীতকণ্ঠে বলিল, বড়দা, একবার পায়ের ধুলো যদি দিতে পারেন—

বেণী গম্ভীর হইয়া কহিল, মা যখন গেছেন তখন আমার যাওয়া না-যাওয়া—কি বল গোবিন্দখুড়ো?

গোবিন্দ কথা কহিবার পূর্বেই রমেশ বলিল, আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করতে চাইনে বড়দা, যদি অসুবিধা না হয় একবার দেখেশুনে আসবেন।

বেণী চুপ করিয়া রহিল। গোবিন্দ কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন গোবিন্দ বাহিরের দিকে গলা বাড়াইয়া দেখিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, দেখলে বেণীবাবু, কথার ভাবখানা!

বেণী অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, কথা কহিল না।

পথে চলিতে চলিতে গোবিন্দর কথাগুলো মনে করিয়া রমেশের সমস্ত মন ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে অর্ধেক পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই রাত্রেই আবার বেণী ঘোষালের বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিল। চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে তখন তর্ক কোলাহল উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সে শুনিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সোজা ভিতরে প্রবেশ করিয়া রমেশ ডাকিল, জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন, এত রাত্রে রমেশের গলা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রমেশ? কেন রে?

রমেশ উঠিয়া আসিল। জ্যাঠাইমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, একটু দাঁড়া বাবা, একটা আলো আনতে বলে দি।

আলোয় কাজ নেই জ্যাঠাইমা, তুমি উঠো না। বলিয়া রমেশ অন্ধকারেই একপাশে বসিয়া পড়িল। তখন জ্যাঠাইমা প্রশ্ন করিলেন, এত রাত্তিরে যে?

রমেশ মৃদুকণ্ঠে কহিল, এখনো ত নিমন্ত্রণ করা হয়নি জ্যাঠাইমা, তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করতে এলুম।

তবেই মুশকিলে ফেললি বাবা। এঁরা কি বলেন? গোবিন্দ গাঙ্গুলী, চাটুয্যেমশাই—

রমেশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, জানিনে জ্যাঠাইমা, কি এঁরা বলেন। জানতেও চাইনে—তুমি যা বলবে তাই হবে।

অকস্মাৎ রমেশের কথার উত্তাপে বিশ্বেশ্বরী মনে মনে বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, কিন্তু তখন যে বললি রমেশ, এরাই তোর সবচেয়ে আপনার। তা যাই হোক, আমার মেয়েমানুষের কথায় কি হবে বাবা? এ গাঁয়ে যে আবার—আর এ গাঁয়েই কেন বলি, সব গাঁয়েই এ ওর সঙ্গে খায় না, ও তার সঙ্গে কথা কয় না একটা কাজ-কর্ম পড়ে গেলে আর মানুষের দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না। কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখা যায়, এর চেয়ে শক্ত কাজ আর গ্রামের মধ্যে নেই।

রমেশ বিশেষ আশ্চর্য হইল না। কারণ, এই কয়দিনের মধ্যেই সে অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, কেন এ রকম হয় জ্যাঠাইমা?

সে অনেক কথা বাবা। যদি থাকিস এখানে আপনিই সব জানতে পারবি। কারুর সত্যকার দোষ-অপরাধ আছে, কারুর মিথ্যে-অপবাদ আছে—তা ছাড়া মামলা-মোকদ্দমা, মিথ্যে সাক্ষী-দেওয়া নিয়েও মস্ত দলাদলি। আমি যদি তোর ওখানে দু'দিন আগে যেতুম রমেশ, তা হলে এত উদ্যোগ-আয়োজন কিছুতেই

করতে দিতুম না। কি যে সেদিন হবে, তাই কেবল আমি ভাবচি, বলিয়া জ্যাঠাইমা একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। সে নিশ্বাসে যে কি ছিল, তাহার ঠিক মর্ম্মটি রমেশ ধরিতে পারিল না। এবং কাহারও সত্যকার অপরাধই বা কি এবং কাহারও মিথ্যা অপবাদই বা কি হইতে পারে, তাহাও ঠাহর করিতে পারিল না, বরঞ্চ উত্তেজিত হইয়া কহিল, কিন্তু আমার সঙ্গে ত তার কোন যোগ নেই। আমি একরকম বিদেশী বললেই হয় কারো সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই। তাই আমি বলি জ্যাঠাইমা, আমি দলাদলির কোন বিচারই করব না, সমস্ত ব্রাহ্মণশূদ্রই নিমন্ত্রণ করে আসব। কিন্তু, তোমার হুকুম ছাড়া ত পারিনে; তুমি হুকুম দাও জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিলেন, এ-রকম হুকুম ত দিতে পারিনে রমেশ। তাতে ভারি গোলযোগ ঘটবে। তবে তোর কথাও যে সত্যি নয়, তাও আমি বলিনে। কিন্তু এ ঠিক সত্যি-মিথ্যের কথা নয় বাবা। সমাজ যাকে শাস্তি দিয়ে আলাদা করে রেখেচে, তাকে জবরদস্তি ডেকে আনা যায় না। সমাজ যাই হোক, তাকে মান্য করতেই হবে। নইলে তার ভাল করবার মন্দ করবার কোন শক্তিই থাকে না—এ-রকম হ'লে ত কোনমতে চলতে পারে না রমেশ!

ভাবিয়া দেখিলে রমেশ এ কথা যে অস্বীকার করিতে পারিত তাহা নহে; কিন্তু এইমাত্র নাকি বাহিরে এই সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের ষড়যন্ত্র এবং নীচাশয়তা তাহার বুকের মধ্যে আগুনের শিখার মত জ্বলিতেছিল—তাই সে তৎক্ষণাৎ ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, এ গাঁয়ের সমাজ বলতে ধর্ম্মদাস, গোবিন্দ—এঁরা ত? এমন সমাজের একবিন্দু ক্ষমতাও না থাকে, সেই ত ঢের ভাল জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা রমেশের উষ্ণতা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু শান্তকণ্ঠে বলিলেন, শুধু এরা নয় রমেশ, তোমার বড়দা বেণীও সমাজের একজন কর্ত্তা।

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। তিনি পুনরপি বলিলেন, তাই আমি বলি, এঁদের মত নিয়ে কাজ করো গে রমেশ! সবেমাত্র বাড়িতে পা দিয়েই এদের বিরুদ্ধতা করা ভাল নয়।

বিশ্বেশ্বরী কতটা দূর চিন্তা করিয়া যে এরূপ উপদেশ দিলেন, তীব্র উত্তেজনার মুখে রমেশ তাহা ভাবিয়া দেখিল না; কহিল, তুমি নিজে এইমাত্র বললে জ্যাঠাইমা, নানান্ কারণে এখানে দলাদলির সৃষ্টি হয়। বোধ করি, ব্যক্তিগত আক্রোশটাই সবচেয়ে বেশি। তা ছাড়া, আমি যখন সত্যি-মিথ্যে কারো দোষ-অপরাধের কথাই জানিনে, তখন কোন লোককেই বাদ দিয়ে অপমান করা আমার পক্ষে অন্যায়।

জ্যাঠাইমা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, ওরে পাগলা, আমি তোর গুরুজন, মায়ের মতো। আমার কথাটা না শোনাও ত তোর পক্ষে অন্যায়।

কি করবো জ্যাঠাইমা, আমি স্থির করেচি, আমি সকলকেই নিমন্ত্রণ করবো।

তাহার দৃঢ়সংকল্প দেখিয়া বিশ্বেশ্বরীর মুখ অপ্রসন্ন হইল; বোধ করি বা

মনে মনে বিরক্ত হইলেন ; বলিলেন, তা হলে হুকুম নিতে আসাটা তোমার শুধু একটা ছলনামাত্র।

জ্যাঠাইমার বিরক্তি রমেশ লক্ষ্য করিল, কিন্তু বিচলিত হইল না। খানিক পরে আস্তে আস্তে বলিল, আমি জানতুম জ্যাঠাইমা, যা অন্যায় নয়, আমার সে কাজে তুমি প্রসন্নমনে আমাকে আশীর্বাদ করবে। আমার—

তাহার কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই বিশ্বেশ্বরী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু এটাও ত তোমার জানা উচিত ছিল রমেশ যে, আমার সন্তানের বিরুদ্ধে আমি যেতে পারব না ?

কথাটা রমেশকে আঘাত করিল। কারণ, মুখে সে যাই বলুক, কেমন করিয়া তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ কাল হইতে এই জ্যাঠাইমার কাছে সন্তানের দাবি করিতেছিল এখন দেখিল, এ দাবির অনেক ঊর্ধ্বে তাঁর আপন সন্তানের দাবি জায়গা জুড়িয়া আছে। সে ক্ষণকালমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া চাপা অভিমানের সুরে বলিল, কাল পর্যন্ত তাই জানতুম জ্যাঠাইমা! তাই তোমাকে তখন বলেছিলুম, যা পারি আমি একলা করি, তুমি এসো না ; তোমাকে ডাকবার সাহসও আমার হয়নি।

এই ক্ষুদ্র অভিমান জ্যাঠাইমার অগোচর রহিল না। কিন্তু আর জবাব দিলেন না, অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে রমেশ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই বলিলেন, তবে একটু দাঁড়াও বাছা, তোমার ভাঁড়ার ঘরের চাবিটা এনে দিই, বলিয়া ভিতর হইতে চাবি আনিয়া রমেশের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চাবিটা তুলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। ঘণ্টাকয়েক মাত্র পূর্বে সে মনে মনে বলিয়াছিল, আর আমার ভয় কি, আমার জ্যাঠাইমা আছেন। কিন্তু একটা রাত্রিও কাটিল না, তাহাকে আবার নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে হইল, না, আমার কেউ নেই—জ্যাঠাইমাও আমাকে ত্যাগ করেছেন।

॥ চার ॥

বাহিরে এইমাত্র শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। আসন হইতে উঠিয়া রমেশ অভ্যাগতদিগের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছে—বাড়ির ভিতরে আহারের জন্য পাতা পাতিবার আয়োজন হইতেছে, এমন সময় একটা গোলমাল হাঁকাহাঁকি শুনিয়া রমেশ ব্যস্ত হইয়া ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আসিল। ভিতরে রন্ধনশালার কপাটের একপাশে একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের বিধবা মেয়ে জড়সড় হইয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং আর একটি প্রৌঢ় রমণী তাহাকে আগলাইয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধে চোখ-মুখ রক্তবর্ণ করিয়া চীৎকারে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির করিতেছে। বিবাদ বাধিয়াছে পরাণ হালদারের সহিত। রমেশকে

দেখিবামাত্র প্রৌঢ়া চেঁচাইয়া প্রশ্ন করিল, হাঁ বাবা, তুমি গাঁয়ের একজন জমিদার, বলি, যত দোষ কি এই ক্ষেন্তি বামনির মেয়ের? মাথার ওপর আমাদের কেউ নেই বলে কি যতবার খুশি শাস্তি দেবে?

গোবিন্দকে দেখিয়াই কহিল, ঐ উনি মুখুয্যেবাড়ির গাছ-পিতিষ্ঠের সময় জরিমানা বলে ইস্কুলের নামে দশ টাকা আমার কাছে আদায় করেন নি কি? গাঁয়ের ষোল আনা শেতলা-পুজোর জন্যে দুজোড়া পাঁঠার দাম ধরে নেন নি কি? তবে? কতবার ঐ এক কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চান শুনি?

রমেশ ব্যাপারটা কি, কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। গোবিন্দ গাঙ্গুলী বসিয়াছিল, মীমাংসা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার রমেশের দিকে একবার প্রৌঢ়ার দিকে চাহিয়া গম্ভীর গলায় কহিলেন, যদি আমার নামটাই করলে ক্ষান্তমাসি, তবে সত্যি কথা বলি বাছা। খাতিরে কথা কইবার লোক এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী নয়, সে দেশসুদ্ধ লোক জানে। তোমার মেয়ের প্রাশ্চিত্যও হয়েচে, সামাজিক জরিমানাও আমরা করেছি—সব মানি। কিন্তু তাকে যজ্ঞিতে কাঠি দিতে ও আমরা হুকুম দিইনি। মলে ওকে পোড়াতে আমরা কাঁধ দেব, কিন্তু—

ক্ষান্তমাসি চীৎকার করিয়া উঠিল, মলে তোমার নিজের মেয়েকে কাঁধে করে পুড়িয়ে এসো বাছা—আমার মেয়ের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। বলি, হাঁ গোবিন্দ, নিজের গায়ে হাত দিয়ে কি কথা কও না? তোমার ছোটভাজ যে ঐ ভাঁড়ারঘরে বসে পান সাজচে, সে ত আর বছর মাস-দেড়েক ধরে কোন্ কাশীবাস করে এমন হলদে রোগা শলতেটির মত হয়ে ফিরে এসেছিল শুনি? সে বড়-লোকের বড় কথা বুঝি? বেশি ঘাঁটিয়ো না বাপু, আমি সব জারিজুরি ভেঙ্গে দিতে পারি। আমরাও ছেলেমেয়ে পেটে ধরেচি, আমরা চিনতে পারি। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না।

গোবিন্দ ক্ষ্যাপার মত ঝাঁপাইয়া পড়িল, তবে রে হারামজাদা মাগী—

কিন্তু হারামজাদা মাগী একটুও ভয় পাইল না বরং এক পা আগাইয়া আসিয়া হাত-মুখ ঘুরাইয়া কহিল, মারবি নাকি রে? ক্ষেন্তি বামনিকে ঘাঁটালে ঠক বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে তা বলে দিচ্চি। আমার মেয়ে ত বামুন্দের ঢুকতে যায়নি; দোরগোড়ায় আসতে না আসতে হালদার ঠাকুরপো যে খামকা অপমান করে বসলো, বলি তার চোয়ানের তাঁতে অপবাদ ছিল না কি? আমি ত আর আজকের নই গো, বলি, আরও বলব, না, এতেই হবে?

রমেশ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভৈরব আচার্য ব্যস্ত হইয়া ক্ষান্তর হাতটা প্রায় ধরিয়া ফেলিয়া সানুনয়ে কহিল এতেই হবে মাসি, আর কাজ নেই। নে, সুকুমারী ওঠ মা, চল্ বাছা, আমার সঙ্গে ও ঘরে গিয়ে বসবি চল।

পরাণ হালদার চাদর কাঁধে লইয়া সোজা খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিল, এই বেশ্যে মাগীদের বাড়ি থেকে একেবারে তাড়িয়ে না দিলে এখানে আমি জলগ্রহণ করব না তা বলে দিচ্চি। গোবিন্দ! কালীচরণ! তোমাদের মামাকে চাও ত উঠে এসো বলচি। বেণী ঘোষাল যে তখন বলেছিল, মামা, যেয়ো না ওখানে! এমন সব খান্‌কী নটীর কাণ্ডকারখানা জানলে কি জাতজন্ম খোয়াতে এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াই? কালী! উঠে এসো।

মাতুলের পুনঃপুনঃ আহ্বানেও কিন্তু কালীচরণ ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। সে পাটের ব্যবসা করে। বছর চারেক পূর্বে কলিকাতাবাসী তাহার এক গণ্যমান্য খরিদ্দার বন্ধু তাহার বিধবা ছোট ভগ্নীটিকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল ঘটনাটি গোপন ছিল না। হঠাৎ শ্বশুরবাড়ি যাওয়া এবং তথা হইতে তীর্থযাত্রা ইত্যাদি প্রসঙ্গে কিছুদিন চাপা ছিল মাত্র। পাছে এই দুর্ঘটনার ইতিহাস এত লোকের সমক্ষে আবার উঠিয়া পড়ে এই ভয়ে কালী মুখ তুলিতে পারিল না। কিন্তু গোবিন্দের গায়ের জ্বালা আদৌ কমে নাই। সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া জোর গলায় কহিল, যে যাই বলুক না কেন, এ অঞ্চলে সমাজপতি হলেন বেণী ঘোষাল, পরাণ হালদার আর যদু মুখুয্যেমশায়ের কন্যা। তাঁদের আমরা ত কেউ ফেলতে পারব না। রমেশ বাবাজী সমাজের অমতে এই দুটো মাগীকে কেন বাড়ি ঢুকতে দিয়েচেন, তার জবাব না দিলে আমরা এখানে জলটুকু পর্যন্ত মুখে দিতে পারব না।

দেখিতে দেখিতে পাঁচ-সাত-দশজন চাদর কাঁধে ফেলিয়া একে একে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহারা পাড়াগাঁয়ের লোক, সামাজিক ব্যাপারে কোথায় কোন চাল সর্বাপেক্ষা লাভজনক ইহা ত ইহাদের অবিদিত নহে।

নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা যাহারা যা খুশি বলিতে লাগিল। ভৈরব এবং দীনু ভট্‌চায্ কাঁদ কাঁদ হইয়া বার বার ক্ষ্যান্তমাসি ও তাহার মেয়ের, একবার গাঙ্গুলী, একবার হালদার মহাশয়ের হাতে-পায়ে ধরিবার উপক্রম করিতে লাগিল চারিদিক হইতে সমস্ত অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া-কর্ম যেন লণ্ডভণ্ড হইবার সূচনা প্রকাশ করিল। কিন্তু রমেশ একটি কথা কহিতে পারিল না। একে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর, তাহাতে অকস্মাৎ এই অভাবনীয় কাণ্ড। সে পাংশুমুখে কেমন যেন একরকম হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

রমেশ!

অকস্মাৎ একমুহূর্তে সমস্ত লোকের সচকিত দৃষ্টি এক হইয়া বিশ্বেশ্বরীর মুখের উপর গিয়া পড়িল। তিনি ভাঁড়ার হইতে বাহির হইয়া কপাটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার মাথার উপর আঁচল ছিল কিন্তু মুখখানি অনাবৃত। রমেশ দেখিল, জ্যাঠাইমা আপনিই কখন আসিয়াছেন—তাহাকে ত্যাগ করেন নাই। বাহিরের লোক দেখিল ইনিই বিশ্বেশ্বরী, ইনিই ঘোষাল-বাড়ির গিন্নীমা।

পল্লীগ্রামে শহরের কড়া পর্দা নাই। তত্রাচ বিশ্বেশ্বরী বড়বাড়ির বধূ বলিয়াই হোক কিংবা অন্য যে-কোন কারণেই হোক, যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্তিসত্ত্বেও সাধারণতঃ কাহারো সাক্ষাতে বাহির হইতেন না। সুতরাং সকলেই বড় বিস্মিত হইল। যাহারা শুধু শুনিয়াছিল, কিন্তু ইতিপূর্বে কখনো চোখে দেখে নাই, তাহারা তাঁহার আশ্চর্য চোখ-দুটির পানে চাহিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল। বোধ করি, তিনি হঠাৎ ক্রোধবশেই বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। সকলে মুখ তুলিবামাত্রই তিনি তৎক্ষণাৎ থামের পার্শ্বে সরিয়া গেলেন। সুস্পষ্ট তীব্র আহ্বানে রমেশের বিহ্বলতা ঘুচিয়া গেল। সে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। জ্যাঠাইমা আড়াল হইতে তেমনি সুস্পষ্ট উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, গাঙ্গুলীমশায়কে ভয় দেখাতে মানা করে দে রমেশ! আর হালদারমশায়কে আমার নাম করে বল্ যে, আমি সবাইকে আদর করে বাড়িতে ডেকে এনেচি, সুকুমারীকে অপমান করবার ওঁর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার কাজ-কর্মের বাড়িতে হাঁকাহাঁকি, গালি-গালাজ করতে আমি নিষেধ করচি। যাঁর অসুবিধে হবে তিনি আর কোথাও গিয়ে বসুন।

বড়গিন্নীর কড়া হুকুম সকলে নিজের কানে শুনিতে পাইল। রমেশের মুখ ফুটিয়া বলিতে হইল না—হইলে সে পারিত না। ইহার ফল কি হইল, তাহা সে দাঁড়াইয়া দেখিতেও পারিল না। জ্যাঠাইমাকে সমস্ত দায়িত্ব নিজের মাথায় লইতে দেখিয়া সে কোনমতে চোখের জল চাপিয়া দ্রুতপদে একটা ঘরে গিয়া ঢুকিল; তৎক্ষণাৎ তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আজ সারাদিন সে নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল, কে আসিল, না আসিল তাহার খোঁজ লইতে পারে নাই। কিন্তু আর যেই আসুক, জ্যাঠাইমা যে আসিতে পারেন, ইহা তাহার সুদূর কল্পনার অতীত ছিল। যাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা আস্তে আস্তে বসিয়া পড়িল। শুধু গোবিন্দ গাঙ্গুলী ও পরাণ হালদার আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কে একজন তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া ভিড়ের ভিতর হইতে অস্ফুট কহিল, বসে পড় না খুড়ো? ষোলখানা লুচি চারজোড়া সন্দেশ কে কোথায় খাইয়ে-দাইয়ে সঙ্গে দেয় বাবা!

পরাণ হালদার ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য, গোবিন্দ গাঙ্গুলী সত্যই বসিয়া পড়িল। তবে মুখখানা সে বরাবর ভারী করিয়া রাখিল এবং আহারের জন্য পাতা পড়িলে তত্ত্বাবধানের ছুতা করিয়া সকলের সঙ্গে পঙক্তি-ভোজনে উপবেশন করিল না। যাহারা তাহার এই ব্যবহার লক্ষ্য করিল তাহারা সকলেই মনে মনে বুঝিল, গোবিন্দ সহজে কাহাকেও নিষ্কৃতি দিবে না। অতঃপর আর কোন গোলযোগ ঘটিল না। ব্রাহ্মণেরা যাহা ভোজন করিলেন, তাহা চোখে না দেখিলে প্রত্যক্ষ করা শক্ত এবং প্রত্যেকেই খেঁদি, পটল, ন্যাড়া, বুড়ি প্রভৃতি বাটীর অনুপস্থিত বালকবালিকার নাম করিয়া যাহা বাঁধিয়া লইলেন তাহাও যৎকিঞ্চিৎ নহে।

সন্ধ্যার পর কাজ-কর্ম প্রায় সারা হইয়াছে, রমেশ সদর দরজার বাহিরে একটা পেয়ারাগাছের তলায় অন্যমনস্কের মত দাঁড়াইয়াছিল, মনটা তাহার ভাল ছিল না। দেখিল, দীনু ভট্টাচার্য ছেলেদের লইয়া যাইতেছে। সর্বপ্রথমে খেঁদির নজর পড়ায় সে অপরাধীর মত থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, বাবা, বাবু দাঁড়িয়ে -

সবাই যেন একটু জড়সড় হইয়া পড়িল। ছোট মেয়েটির এই একটি কথা হইতেই রমেশ সমস্ত ইতিহাসটা বুঝিতে পারিল; পলাইবার পথ থাকিলে সে নিজেই পলাইত। কিন্তু সে উপায় ছিল না বলিয়া আগাইয়া আসিয়া সহাস্যে কহিল, খেঁদি, এ-সব কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিস রে?

তাহাদের ছোট-বড় পুঁটুলিগুলির ঠিক সদুত্তর খেঁদি দিতে পারিবে না আশংকা করিয়া দীনু নিজেই একটুখানি শুষ্কভাবে হাসিয়া বলিল, পাড়ার ছোট-লোকদের ছেলেপিলেরা আছে ত বাবা, এঁটো-কাঁটাগুলো নিয়ে গেলে তাদের দুখানা-চারখানা দিতে পারব। সে যাই হোক বাবা, কেন যে দেশসুদ্ধ লোক ওঁকে গিন্নীমা বলে ডাকে তা আজ বুঝলুম।

রমেশ তাহার কোন উত্তর না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফটকের ধার পর্যন্ত আসিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ভট্চায্যিমশাই, আপনি ত এদিকের সমস্তই জানেন, এ গাঁয়ে এত রেষারেষি কেন বলতে পারেন?

দীনু মুখে একটা আওয়াজ করিয়া বার-দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হায় রে বাবাজী, আমাদের কুঁয়াপুর ত পদে আছে। যে কাণ্ড এ কদিন ধরে খেঁদির মামার বাড়িতে দেখে এলুম! বিশ ঘর বামুন-কায়েতের বাস নেই, গাঁয়ের মধ্যে কিন্তু চারটে দল। হরনাথ বিশ্বেস দুটো বিলিতি আমড়া পেড়েছিল বলে তার আপনার ভাগ্নেকে জেলে দিয়ে তবে ছাড়লে। সমস্ত গ্রামেই বাবা এই রকম তা ছাড়া মামলায় মামলায় একেবারে শতচ্ছিন্ন! -খেঁদি, হরিধনের হাতটা একবার বদলে নে মা।

রমেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, এর কি কোন প্রতিকার নেই ভট্চায্যিমশাই?

প্রতিকার আর কি করে হবে বাবা এ যে ঘোর কলি! ভট্টাচার্য একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবে একটা কথা বলতে পারি বাবাজী। আমি ভিক্ষে-সিক্ষে করতে অনেক জায়গায়েই ত যাই—অনেকে অনুগ্রহ করেন। আমি বেশ দেখেচি, তোমাদের ছেলেছোকরাদের দয়াধর্ম আছে—নেই কেবল বুড়ো ব্যাটাদের। এরা একটু বাগে পেলে আর একজনের গলায় পা দিয়ে জিভ বার না করে আর ছেড়ে দেয় না। বলিয়া দীনু যেমন ভঙ্গি করিয়া জিভ বাহির করিয়া দেখাইল, তাহাতে রমেশ হাসিয়া ফেলিল।

দীনু কিন্তু হাসিতে যোগ দিল না, কহিল, হাসির কথা নয় বাবাজী, অতি সত্য কথা। আমি নিজেও প্রাচীন হয়েচি—কিন্তু তুমি যে অন্ধকারে অনেকদূরে এগিয়ে এলে বাবাজী।

তা হোক ভট্চাষ্যিমশাই, আপনি বলুন।

কি আর বলব বাবা, পাড়াগাঁ মাত্রই এই রকম। এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী—এ ব্যাটার পাপের কথা মুখে আনলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। ক্ষ্যান্তবামনি ত আর মিথ্যে বলেনি—কিন্তু সবাই ওকে ভয় করে। জাল করতে, মিথ্যে সাক্ষী, মিথ্যে মোকদ্দমা সাজাতে ওর জুড়ি নেই। বেণীবাবু হাতধরা—কাজেই কেউ একটি কথা কইতে সাহস করে না, বরঞ্চ ও-ই পাঁচজনের জাত মেরে বেড়ায়।

রমেশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চুপ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। রাগে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিতেছিল। দীনু নিজেই বলিতে লাগিল—এই আমার কথা তুমি দেখে নিও বাবা, ক্ষ্যান্তবামনি সহজে নিস্তার পাবে না। গোবিন্দ গাঙ্গুলী, পরাণ হালদার দু-দুটো ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া কি সহজ কথা। কিন্তু যাই বল বাবা, মাগীর সাহস আছে। আর সাহস থাকবে নাই বা কেন? মুড়ী বেচে খায়, সব ঘরে যাতায়াত করে, সকলের সব কথা টের পায়। ওকে ঘাঁটালে কেলেংকারীর সীমা-পরিসীমা থাকবে না তা বলে দিচ্চি। অনাচার আর কোন ঘরে নেই বল? বেণীবাবুকেও—

রমেশ সভয়ে বাধা দিয়া বলিল, থাক্, বড়দার কথায় আর কাজ নেই—

দীনু অপ্রতিভ হইয়া উঠিল। কহিল, থাক্ বাবা, আমি দুঃখী মানুষ, কারো কথায় আমার কাজ নেই। কেউ যদি বেণীবাবুর কানে তুলে দেয় ত আমার ঘরে আগুন

রমেশ আবার বাধা দিয়া কহিল, ভট্চাষ্যিমশাই, আপনার বাড়ি কি আরো দূরে?

না বাবা, বেশি দূর নয়, এই বাঁধের পাশেই আমার কুঁড়ে কোন দিন যদি—

আসব বৈ কি, নিশ্চয় আসব। বলিয়া রমেশ ফিরিতে উদ্যত হইয়া কহিল, আবার কাল সকালেই ত দেখা হবে—কিন্তু তার পরেও মাঝে মাঝে পায়ের ধুলো দেবেন, বলিয়া রমেশ ফিরিয়া গেল।

দীর্ঘজীবী হও—বাপের মত হও। বলিয়া দীনু ভট্চায অন্তরের ভিতর হইতে আশীর্বচন করিয়া ছেলেপুলে লইয়া চলিয়া গেল।

॥ পাঁচ ॥

এ পাড়ার একমাত্র মধু পালের মুদীর দোকান নদীর পথে হাটের একধারে। দশ বারদিন হইয়া গেল, অথচ সে বাকি দশ টাকা লইয়া যায় নাই বলিয়া রমেশ কি মনে করিয়া নিজেই একদিন সকালবেলা দোকানের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। মধু পাল মহাসমাদর করিয়া ছোটবাবুকে বারান্দার উপর মোড়া পাতিয়া বসাইল এবং ছোটবাবুর আসিবার হেতু শুনিয়া গভীর আশ্চর্যে অবাক

হইয়া গেল। সে ধারে, সে উপযাচক হইয়া ঘর বহিয়া ঋণশোধ করিতে আসে, তাহা মধু পাল এতটা বয়সে কখনো চোখে ত দেখেই নাই, কানেও শোনে নাই। কথায় কথায় অনেক কথা হইল। মধু কহিল, দোকান কেমন করে চলবে বাবু? দু আনা, চার আনা, এক টাকা, পাঁচ-সিকে করে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট টাকা বাকি পড়ে আছে। এই দিয়ে যাচ্ছি বলে দু'মাসেও আদায় হবার জো নেই। এ কি, বাড়ুয্যেমশাই যে! কবে এলেন? প্রাতঃপেন্নাম হই।

বাঁড়ুয্যেমশায়ের বা হাতে একটা গাড়ু, পায়ে নখে গোড়ালিতে কাদার দাগ, কানে পৈতা জড়ানো, ডান হাতে কচুপাতায় মোড়া চারিটি কুচোচিংড়ি। তিনি ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কাল রাত্তিরে এলুম, তামাক খা' দিকি মধু—বলিয়া গাড়ু রাখিয়া হাতের চিংড়ি মেলিয়া ধরিয়া বলিলেন, সিরুবি জেলেনীর আক্কেল দেখলি মধু, খপ্ করে হাতটা আমার ধরে ফেললে? কালে কালে কি হ'ল বল দেখি রে, এই কি এক পয়সার চিংড়ি? বামুনকে ঠকিয়ে ক-কাল খাবি মাগী, উচ্ছন্ন যেতে হবে না?

মধু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, হাত ধরে ফেললে আপনার?

ক্রুদ্ধ বাঁড়ুয্যেমশায় একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, আড়াইটি পয়সা শুধু বাকী, তাই বলে খামকা হাটসুদ্ধ লোকের সামনে হাত ধরবে আমার? কে না দেখলে বল! মাঠ থেকে বসে এসে গাড়ুটি মেজে নদীতে হাত-পা ধুয়ে মনে করলুম, হাটটা একেবারে ঘুরে যাই! মাগী এক চুবড়ি মাছ নিয়ে বসে—আমাকে স্বচ্ছন্দে বললে কিনা, কিছু নেই ঠাকুর, যা ছিল সব উঠে গেছে। আরে আমার চোখে ধুলো দিতে পারিস? ডালাটা ফস্ করে তুলে ফেলতেই দেখি না—অমনি ফস্ করে হাতটা চেপে ধরে ফেললে। তোর সেই আড়াইটা—আর আজকের একটা -এই সাড়ে-তিনটে পয়সা নিয়ে আমি গাঁ ছেড়ে পালাব? কি বলিস মধু?

মধু সায় দিয়া কহিল, তাও কি হয়!

তবে তাই বল না। গাঁয়ে কি শাসন আছে? নইলে যষ্ঠে জেলেব ধোপা-নাপতে বন্ধ করে চাল কেটে তুলে দেওয়া যায় না?

হঠাৎ রমেশের প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, বাবুটি কে মধু?

মধু সগর্বে কহিল, আমাদেব ছোটবাবুর ছেলে যে! সেদিনের দশ টাকা বাকী ছিল বলে নিজে বাড়ি বয়ে দিতে এসেছেন।

বাঁড়ুয্যেমশায় কুচোচিংড়ির অভিযোগ ভুলিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, আঁ, রমেশ বাবাজী? বেঁচে থাক বাবা। হাঁ, এসে শুনলুম একটা কাজের মত কাজ করেচ বটে! এমন খাওয়া-দাওয়া এ অঞ্চলে কখনও হয়নি। কিন্তু বড় দুঃখ রইল চোখে দেখতে পেলুম না। পাঁচ শালার ধাপ্পায় পড়ে কলকাতায় চাকরি করতে গিয়ে হাঁড়ির হাল। আরে ছি, সেখানে মানুষ থাকতে পারে!

রমেশ এই লোকটার মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। কিন্তু দোকানসুদ্ধ সকলে তাহার কলিকাতা-প্রবাসের ইতিহাস শুনিবার জন্য মহা কৌতূহলী হইয়া উঠিল। তামাক সাজিয়া মধু দোকানি বাঁড়ুয্যের হাতে হুঁকাটা তুলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, তার পরে ? একটা চাকরি-বাকরি হয়েছিল ত ?

হবে না ? এ কি ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা আমার ? হ'লে হবে কি—সেখানে কে থাকতে পাবে বল্। যেমনি ধোঁয়া তেমনি কাদা। বাইরে বেরিয়ে গাড়ি-ঘোড়া চাপা না পড়ে যদি ঘরে ফিরতে পারিস ত জানবি তোর বাপের পুণ্যি।

মধু কখনও কলিকাতায় যায় নাই। মেদিনীপুর শহরটা একবার সাক্ষ্য দিতে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছিল মাত্র। সে ভারি আশ্চর্য হইয়া কহিল, বলেন কি !

বাঁড়ুয্যে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তোর রমেশবাবুকে জিজ্ঞাসা কর না, সত্যি কি মিথ্যে। না মধু, খেতে না পাই, বুকে হাত দিয়ে পড়ে থাকব সেও ভাল, কিন্তু বিদেশ যাবার নামটি যেন কেউ আমার কাছে আর না করে। বললে বিশ্বাস করবি নে, সেখানে সুষনি-কলমি শাক, চালতা, আমড়া, থোড়, মোচা পর্যন্ত কিনে খেতে হয়। পারবি খেতে ? এই একটি মাস না খেয়ে খেয়ে যেন রোগা ইঁদুরটি হয়ে গেছি। দিবারাত্রি পেট ফুট্‌ফাট্ করে, বুক জ্বালা করে, প্রাণ আইঢাই করে, পালিয়ে এসে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। না বাবা, নিজের গাঁয়ে বসে জোটে একবেলা একসন্ধ্যা খাব, না জোটে, ছেলেমেয়ের হাত ধরে ভিক্ষে করব, বামুনের ছেলের তাতে কিছু আর লজ্জার কথা নেই, কিন্তু মা-লক্ষ্মী মাথায় থাকুক বিদেশে কেউ যেন না যায়।

তাঁহার কাহিনী শুনিয়া সকলে যখন সভয়ে নির্বাক হইয়া গিয়াছে তখন বাঁড়ুয্যে উঠিয়া আসিয়া মধুর তেলের ভাঁড়ের ভিতরে উড়খি ডুবাইয়া এক ছটাক তেল বাঁ হাতের তেলোয় লইয়া অর্ধেকটা দুই নাক ও কানের গর্তে ঢালিয়া দিয়া বাকীটা মাথায় মাখিয়া ফেলিলেন ও কহিলেন, বেলা হয়ে গেল, অমনি ডুবটা দিয়ে একেবারে ঘরে যাই। এক পয়সার নুন দে দেখি মধু, পয়সাটা বিকেলবেলা দিয়ে যাবো।

আবার বিকেলবেলা ? বলিয়া মধু অপ্রসন্নমুখে নুন দিতে তাহার দোকানে উঠিল। বাঁড়ুয্যে গলা বাড়াইয়া দেখিয়া বিস্ময়-বিরক্তির স্বরে কহিয়া উঠিলেন, তোরা সব হলি কি মধু ? এ যে গালে চড় মেরে পয়সা নিস দেখি ? বলিয়া আগাইয়া আসিয়া নিজেই এক খামচা নুন তুলিয়া ঠোঙ্গায় দিয়া সেটা টানিয়া লইলেন। গাড়ু হাতে করিয়া রমেশের প্রতি চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ঐ ত একই পথ ; চল না বাবাজী, গল্প করতে করতে যাই।

চলুন, বলিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। মধু দোকানি অনতিদূরে দাঁড়াইয়া

করুণকণ্ঠে কহিল, বাঁড়ুয্যেমশাই, সেই ময়দার পয়সা পাঁচ আনা কি অমনি—

বাঁড়ুয্যে রাগিয়া উঠিল—হাঁ রে মধু, দুবেলা চোখাচোখি হবে—তোদের কি চোখের চামড়া পর্যন্ত নেই? পাঁচ ব্যাটা-বেটির মতলবে কলকাতায় যাওয়া-আসা করতে পাঁচ-পাঁচটা টাকা আমার গলে গেল—আর এই কি তোদের তাগাদা করবার সময় হ'ল। কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস—দেখলে বাবা রমেশ, এদের ব্যাভারটা একবার দেখলে?

মধু এতটুকু হইয়া গিয়া অস্ফুটে বলিতে গেল, অনেক দিনের—

হলেই বা অনেক দিনের? এমন করে সবাই মিশে পিছনে লাগলে ত আর গাঁয়ে বাস করা যায় না, বলিয়া বাঁড়ুয্যে একরকম রাগ করিয়াই নিজের জিনিসপত্র লইয়া চলিয়া গেলেন।

রমেশ ফিরিয়া আসিয়া বাড়ি ঢুকিতেই এক ভদ্রলোক শশব্যস্তে হাতের হুঁকাটা একপাশে রাখিয়া দিয়া একেবারে পায়ের কাছে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। উঠিয়া কহিল, আমি বনমালী পাড়ুই আপনাদের ইস্কুলের হেডমাস্টার। দুদিন এসে সাক্ষাৎ পাইনি; তাই বলি—

রমেশ সমাদর করিয়া পাড়ুইমহাশয়কে চেয়ারে বসাইতে গেল; কিন্তু সে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রহিল। কহিল, আজ্ঞে, আমি যে আপনার ভৃত্য।

লোকটা বয়সে প্রাচীন এবং আর যা'ই হোক একটা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাহার এই অতিবিনীত কুণ্ঠিত ব্যবহারে রমেশের মনের মধ্যে একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিল। সে কিছুতেই আসনগ্রহণে স্বীকৃত হইল না, খাড়া দাঁড়াইয়া নিজের বক্তব্য কহিতে লাগিল। এদিকের মধ্যে এই একটি অতি ছোট-রকমের ইস্কুল মুখুয্যে ও ঘোষালদের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন ছাত্র পড়ে। দুই-তিন ক্রোশ দূর হইতেও কেহ কেহ আসে। যৎকিঞ্চিৎ গভর্নমেণ্ট সাহায্য আছে, তথাপি ইস্কুল আর চলিতে চাহিতেছে না; ছেলেবয়সে এই বিদ্যালয়ে রমেশও কিছুদিন পড়িয়াছিল তাহার স্মরণ হইল। পাড়ুইমহাশয় জানাইল যে, চাল ছাওয়া না হইলে আগামী বর্ষায় বিদ্যালয়ের ভিতর আর কেহ বসিতে পারিবে না। কিন্তু সে না হয় পরে চিন্তা করিলে চলিবে, উপস্থিত প্রধান দুর্ভাবনা হইতেছে যে তিন মাস হইতে শিক্ষকেরা কেহ মাহিনা পায় নাই—সুতরাং ঘরের খাইয়া বনামহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতে আর কেহ পারিতেছে না।

ইস্কুলের কথায় রমেশ একেবারে সজাগ হইয়া উঠিল। হেডমাস্টার মহাশয়কে বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া একটি একটি করিয়া সমস্ত সংবাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। মাস্টার-পণ্ডিত চারিজন এবং তাহাদের হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে গড়ে দুইজন করিয়া ছাত্র প্রতি বৎসর মাইনর পরীক্ষায় পাস করিয়াছে। তাহাদের নাম-ধাম, বিবরণ পাড়ুইমহাশয় মুখস্থের মত আবৃত্তি করিয়া দিলেন। ছেলেদের নিকট

হইতে যাহা আদায় হয়, তাহাতে নীচের দুজন শিক্ষকের কোন মতে, ও গভর্নমেণ্টের সাহায্যে আর-একজনের সঙ্কুলান হয় ; শুধু একজনের মাহিনাটাই গ্রামের ভিতরে এবং বাহিরে চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। এই চাঁদা সাধিবার ভারও মাস্টারদের উপরেই—তাঁহারা গত তিন-চারি মাস কাল ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেক বাটীতে আট-দশবার করিয়া হাঁটাহাঁটি করিয়া সাত টাকা চারি আনার বেশি আদায় করিতে পারেন নাই।

কথা শুনিয়া রমেশ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পাঁচ-ছয়টা গ্রামের মধ্যে এই একটা বিদ্যালয় এবং এই পাঁচ-ছয়টা গ্রামময় তিন-মাসকাল ক্রমাগত ঘুরিয়া মাত্র সাত টাকা চারি আনা আদায় হইয়াছে। রমেশ প্রশ্ন করিল, আপনার মাহিনা কত ?

মাস্টার কহিল, রসিদ দিতে হয় ছাব্বিশ টাকার, পাই তের টাকা পনের আনা ! কথাটা রমেশ ঠিক বুঝিতে পারিল না—তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মাস্টার তাহা বুঝাইয়া বলিল, আজ্ঞে গভর্নমেণ্টের হুকুম কিনা, তাই ছাব্বিশ টাকার রসিদ লিখে দিয়ে সাব-ইন্‌স্পেক্টারবাবুকে দেখাতে হয়—নইলে সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। সবাই জানে, আপনি কোন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন আমি মিথ্যে বলচি নে।

রমেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এতে ছাত্রদের কাছে আপনার সম্মানহানি হয় না ?

মাস্টার লজ্জিত হইল। কহিল, কি করব রমেশবাবু ! বেণীবাবু এ কয়টি টাকাও দিতে নারাজ।

তিনি কর্তা বুঝি ?

মাস্টার একবার একটুখানি দ্বিধা করিল ; কিন্তু তাহার না বলিলেই নয়। তাই সে ধীরে ধীরে জানাইল যে, তিনিই সেক্রেটারী বটে ; কিন্তু তিনি একটি পয়সাও কখনো খরচ করেন না। যদু মুখুয্যেমহাশয়ের কন্যা সতীলক্ষ্মী তিনি তাঁর দয়া না থাকিলে ইস্কুল অনেক দিন উঠিয়া যাইত। এ বৎসরই নিজের খরচে চাল ছাইয়া দিবেন আশা দিয়াও হঠাৎ কেন যে সমস্ত সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহার কারণ কেহই বলিতে পারে না।

রমেশ কৌতূহলী হইয়া রমার সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর একটি ভাই এ ইস্কুলে পড়ে না ?

মাস্টার কহিল, যতীন ত ? পড়ে বৈ কি।

রমেশ বলিল, আপনার ইস্কুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে, আজ আপনি যান, কাল আমি আপনাদের ওখানে যাব।

যে আজ্ঞে, বলিয়া হেডমাস্টার আর একবার রমেশকে প্রণাম করিয়া জোর করিয়া তাহার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বিদায় হইল।

॥ ছয় ॥

বিশ্বেশ্বরীর সেদিনের কথাটা সেইদিনই দশখানা গ্রামে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বেণী লোকটা নিজে কাহারও মুখের উপর রূঢ় কথা বলিতে পারিত না; তাই সে গিয়া রমার মাসিকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। সেকালে নাকি তক্ষক দাঁত ফুটাইয়া এক বিরাট অশ্বত্থ গাছ জ্বালাইয়া ছাই করিয়া দিয়াছিল। এই মাসিটিও সেদিন সকালবেলায় ঘরে চড়িয়া যে বিষ উদ্গীর্ণ করিয়া গেলেন, তাহাতে বিশ্বেশ্বরীর রক্তমাংসের দেহটা কাঠের নয় বলিয়াই হউক, কিংবা এ-কাল সে-কাল নয় বলিয়াই হউক, জ্বলিয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া গেল না। সমস্ত অপমান বিশ্বেশ্বরী নীরবে সহ্য করিলেন। কারণ, ইহা যে তাঁহার পুত্রের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল, সে কথা তাঁহার অগোচর ছিল না। পাছে রাগ করিয়া একটা কথার জবাব দিতে গেলেও এই স্ত্রীলোকের মুখ দিয়া সর্বাগ্রে তাঁহার নিজের ছেলের কথাই বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাহা রমেশের কর্ণগোচর হয়, এই নিদারুণ লজ্জার ভয়েই সমস্ত সময়টা তিনি কাঠ হইয়া বসিয়া ছিলেন।

তবে পাড়াগাঁয়ে কিছুই ত চাপা থাকিবার জো নাই! রমেশ শুনিতে পাইল। জ্যাঠাইমার জন্য তাহার প্রথম হইতেই বার বার মনের ভিতরে উৎকণ্ঠা ছিল এই লইয়া মাতা-পুত্রে কলহ হইবে সে আশঙ্কাও করিয়াছিল। কিন্তু বেণী যে বাহিরের লোককে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া নিজের মাকে এমন করিয়া অপমান ও নির্যাতন করিবে এই কথাটা সহসা তাহার কাছে একটা সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড বলিয়া মনে হইল এবং পরমুহূর্তেই তাহার ক্রোধের বহ্নি যেন ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভাবিল, ও-বাড়িতে ছুটিয়া গিয়া যা মুখে আসে তাই বলিয়া বেণীকে গালাগালি করিয়া আসে; কারণ, যে লোক এমন করিয়া অপমান করিতে পারে, তাহাকেও অপমান করা সম্বন্ধে কোনরূপ বাছ-বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, তাহা হয় না। কারণ, জ্যাঠাইমার অপমানের মাত্রা তাহাতে বাড়িবে বৈ কমিবে না। সেদিন দীনুর কাছে এবং কাল মাস্টারের মুখে শুনিয়া রমার প্রতি তাহার ভারি একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়াছিল। চতুর্দিকে পরিপূর্ণ মূঢ়তা ও সহস্র প্রকার কদর্য ক্ষুদ্রতার ভিতরে এক জ্যাঠাইমার হৃদয়টুকু ছাড়া সমস্ত গ্রামটাই আঁধারে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া যখন তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল, তখন এই মুখুয্যে-বাটীর পানে চাহিয়া একটুখানি আলোর আভাস তাহা যত তুচ্ছ এবং ক্ষুদ্র হোক তাহার মনের মধ্যে বড় আনন্দ দিয়াছিল। কিন্তু আজ আবার এই ঘটনায় তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত মন ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। বেণীর সঙ্গে যোগ দিয়া এই দুই মাসি ও বোনঝিতে মিলিয়া যে অন্যায় করিয়াছে, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। কিন্তু এই দুইটা স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধেই বা সে কি করিবে এবং বেণীকেই বা কি করিয়া শাস্তি দিবে তাহাও কোন মতে ভাবিয়া পাইল না।

এমন সময়ে একটা কাণ্ড ঘটিল। মুখুয্যে ও ঘোষালদের কয়েকটা বিষয় এখন পর্যন্ত ভাগ হয় নাই। আচার্যদের বাটীর পিছনে 'গড়' বলিয়া পুষ্করিণীটাও এইরূপ উভয়ের সাধারণ সম্পত্তি। এক সময়ে ইহা বেশ বড়ই ছিল ক্রমশঃ সংস্কার-অভাবে বুজিয়া গিয়া এখন সামান্য একটা ডোবায় পরিণত হইয়াছিল। ভাল মাছ ইহাতে ছাড়া হইত না। কই, মাগুর প্রভৃতি যে-সকল মাছ আপনি জন্মায়, তাহাই কিছু ছিল। ভৈরব হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপের পাশের ঘরে গোমস্তা গোপাল সরকার খাতা লিখিতেছিল, ভৈরব ব্যস্ত হইয়া কহিল, সরকারমশাই, লোক পাঠান নি? গড় থেকে মাছ ধরানো হচ্ছে যে!

সরকার কলম কানে গুঁজিয়া মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কে ধরাচ্ছে?

আবার কে? বেণীবাবুর চাকর দাঁড়িয়ে আছে, মুখুয্যেদের খোট্টা দরোয়ানটাও আছে দেখলুম; নেই কেবল আপনাদের লোক। শীগগির পাঠান।

গোপাল কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, আমাদের বাবু মাছ-মাংস খান না।

ভৈরব কহিল, নাই খেলেন, কিন্তু ভাগের ভাগ নেওয়া চাই ত!

গোপাল বলিল, আমরা পাঁচজন ত চাই, বাবু বেঁচে থাকলে তিনিও চাইতেন। কিন্তু রমেশবাবু একটু আলাদা ধরনের। বলিয়া ভৈরবের মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিয়া সহাস্যে একটুখানি শ্লেষ করিয়া কহিল, এ ত তুচ্ছ দুটো সিঙি-মাগুর মাছ আচার্যিমশাই! সেদিন হাটের উত্তরদিকে সেই প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে ওঁরা দু ঘরে ভাগ করে নিলেন, আমাদের কাঠের একটা কুচোও দিলেন না। আমি ছুটে এসে বাবুকে জানাতে তিনি বই থেকে একবার একটু মুখ তুলে হেসে আবার পড়তে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলুম, কি করব বাবু? রমেশবাবু মুখটা আর একবার তোলবারও ফুরসত পেলেন না। তারপর পীড়াপীড়ি করতে বইখানা মুড়ে রেখে একটা হাই তুলে বললেন, কাঠ? তা আর কি তেঁতুলগাছ নেই? শোন কথা! বললুম, থাকবে না কেন। কিন্তু ন্যায্য অংশ ছেড়ে দেবেনই বা কেন, আর কে কোথায় এমন দেয়? রমেশবাবু বইখানা আবার মেলে ধরে মিনিট-পাঁচেক চুপ করে থেকে বললেন, সে ঠিক। কিন্তু দুখানা তুচ্ছ কাঠের জন্য ত আর ঝগড়া করা যায় না!

ভৈরব অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, বলেন কি!

গোপাল সরকার মৃদু হাসিয়া বার-দুই মাথা নাড়িয়া কহিল, বলি ভাল, আচার্যিমশাই, বলি, ভাল! আমি সেই দিন থেকে বুঝেচি, আর মিছে কেন! ছোটতরফের মা-লক্ষ্মী তারিণী ঘোষালের সঙ্গেই অন্তর্ধান হয়েছেন!

ভৈরব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু পুকুরটা যে আমার বাড়ির পিছনেই—আমার একবার জানান চাই।

গোপাল কহিল, বেশ ত ঠাকুর, একবার জানিয়েই এসো না। দিবারাত্রি বই নিয়ে থাকলে, আর শরিকদের এত ভয় করলে কি বিষয়-সম্পত্তি রক্ষে হয়? যদু মুখুয্যের কন্যা—স্ত্রীলোক,সে পর্যন্ত শুনে হেসে কুটিপাটি। গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে ডেকে নাকি সেদিন তামাশা করে বলেছিল, রমেশবাবুকে ব'লো একটা মাসহারা নিয়ে বিষয়টা আমার হাতে দিতে। এর চেয়ে লজ্জা আর আছে? বলিয়া গোপাল রাগে-দুঃখে মুখখানা বিকৃত করিয়া নিজের কাজে মন দিল।

বাটীতে স্ত্রীলোক নাই। সর্বত্রই অবারিত দ্বার। ভৈরব ভিতরে আসিয়া দেখিল রমেশ সামনের বারান্দায় একখানা ভাঙ্গা ইজিচেয়ারের উপর পড়িয়া আছে। রমেশকে তাহার কর্তব্যকর্মে উত্তেজিত করিবার জন্য সে সম্পত্তিরক্ষা সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া কথাটা পাড়িবামাত্র রমেশ বন্দুকের গুলি খাইয়া ঘুমন্ত বাঘের মত গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, কি—রোজ রোজ চালাকি নাকি! ভজুয়া!

তাহার এই অভাবনীয় এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উগ্রতায় ভৈরব ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এই চালাকিটা যে কাহার তাহা সে ঠাহর করিতেই পারিল না। ভজুয়া রমেশের গোরখপুর জেলার চাকর। অত্যন্ত বলবান এবং বিশ্বাসী। লাঠালাঠি করিতে সে রমেশেরই শিষ্য, নিজের হাত পাকাইবার জন্য রমেশ নিজে শিখিয়া ইহাকে শিখাইয়াছিল। ভজুয়া উপস্থিত হইবামাত্র রমেশ তাহাকে খাড়া হুকুম করিয়া দিল--সমস্ত মাছ কাড়িয়া আনিতে এবং যদি কেউ বাধা দেয় তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া আনিতে, যদি না আনা সম্ভব হয়, অন্ততঃ তাহার একপাটি দাঁত যেন ভাঙ্গিয়া দিয়া সে আসে।

ভজুয়া ত এই চায়। সে তাহার তেলেপাকানো লাঠি আনিতে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিল। ব্যাপার দেখিয়া ভৈরব ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। সে বাঙ্গলাদেশের তেলে-জলে মানুষ; হাঁকাহাঁকি, চেঁচামেচিকে মোটে ভয় করে না। কিন্তু ঐ যে অতি দৃঢ়কায় বেঁটে হিন্দুস্থানীটা কথা কহিল না, শুধু ঘাড়টা একবার হেলাইয়া চলিয়া গেল, ইহাতে ভৈরবের তালু পর্যন্ত দুশ্চিন্তায় শুকাইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, যে কুকুর ডাকে না, সে ঠিক কামড়ায়। ভৈরব বাস্তবিক শুভানুধ্যায়ী, তাই সে জানাইতে আসিয়াছিল, যদি সময় মত অকুস্থানে উপস্থিত হইয়া সকার-বকার চীৎকার করিয়া দুটা কই-মাগুর ঘরে আনিতে পারা যায়। ভৈরব নিজেও ইহাতে সাহায্য করিবে মনে করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কৈ, কিছুই ত তাহার হইল না। গালিগালাজের ধার দিয়া কেহ গেল না। মনিব যদি বা একটু হুঙ্কার দিলেন, ভৃত্যটা ঠোঁটটুকু পর্যন্ত নাড়িল না, লাঠি আনিতে গেল। ভৈরব গরীব লোক; ফৌজদারীতে জড়াইবার মত তাহার সাহসও নাই, সম্বলও ছিল না। মুহূর্তকাল পরেই সুদীর্ঘ বংশদণ্ডহাতে

ভজুয়া ঘরের বাহির হইল এবং সেই লাঠি মাথায় ঠেকাইয়া দূর হইতে রমেশকে নমস্কার করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিতেই ভৈরব অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিয়া রমেশের দুই হাত চাপিয়া ধরিল—ওরে ভোজো যাস্‌নে! বাবা রমেশ, রক্ষে কর বাবা, আমি গরীব মানুষ একদণ্ডও বাঁচব না।

রমেশ বিরক্ত হইয়া হাত ছাড়াইয়া লইল! তাহার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নাই। ভজুয়া অবাক হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ভৈরব কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিতে লাগিল, এ কথা ঢাকা থাকবে না বাবা। বেণীবাবুর কোপে পড়ে তাহলে একটা দিনও বাঁচব না। আমার ঘরদোর পর্যন্ত জ্বলে যাবে বাবা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু এলেও রক্ষা করতে পারবে না।

রমেশ ঘাড় হেঁট করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। গোলমাল শুনিয়া গোপাল সরকার খাতা ফেলিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে আস্তে আস্তে বলিল, কথাটা ঠিক বাবু।

রমেশ তাহারও কোন জবাব দিল না, শুধু হাত নাড়িয়া ভজুয়াকে তাহার নিজের কাজে যাইতে আদেশ করিয়া নিজেও নিঃশব্দে ঘরে চলিয়া গেল। তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে কি ভীষণ ঝঞ্ঝার আকারেই এই ভৈরব আচার্যের অপরিসীম ভীতি ও কাতরোক্তি প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা শুধু অন্তর্যামীই দেখিলেন।

॥ সাত ॥

হাঁ রে যতীন, খেলা করছিস, ইস্কুলে যাবিনে?

আমাদের যে আজ কাল দু'দিন ছুটি দিদি!

মাসি শুনিতে পাইয়া কুৎসিত মুখ আরও বিশ্রী করিয়া বলিলেন, মুখপোড়া ইস্কুলে মাসের মধ্যে পনর দিন ছুটি! তুই তাই ওর পিছনে টাকা খরচ করিস্‌, আমি হ'লে আগুন ধরিয়ে দিতুম। বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেলেন। ষোল আনা মিথ্যাবাদিনী বলিয়া যাহারা মাসির অখ্যাতি প্রচার করিত তাহারা ভুল করিত। এমনি এক-আধটা সত্য কথা বলিতেও তিনি পারিতেন এবং আবশ্যক হইলে করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

রমা ছোটভাইটিকে কাছে টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, ছুটি কেন রে যতীন?

যতীন দিদির কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমাদের ইস্কুলের চাল ছাওয়া হচ্চে যে। ছাপা চুনকাম হবে—কত বই এসেচে, চার-পাঁচটা চেয়ার টেবিল, একটা আলমারি, একটা খুব বড় ঘড়ি—একদিন তুমি গিয়ে দেখে এসো না দিদি?

রমা অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কহিল, বলিস কি রে!

হাঁ দিদি সত্যি। রমেশবাবু এসেচেন না - তিনি সব ক'রে দিচ্ছেন। বলিয়া বালক আরও কি কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সম্মুখে মাসিকে আসিতে দেখিয়া রমা তাড়াতাড়ি তাহাকে লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। আদর করিয়া কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া এই ছোটভাইটির মুখ হইতে সে রমেশের ইস্কুল সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিল। প্রত্যহ দুই-এক ঘণ্টা করিয়া তিনি নিজে পড়াইয়া যান, তাহাও শুনিল! হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ রে যতীন, তোকে তিনি চিনতে পারেন?

বালক সগর্বে মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ

কি ব'লে তুই তাঁকে ডাকিস?

এইবার যতীন একটু মুশকিলে পড়িল। কারণ, এতটা ঘনিষ্ঠতার সৌভাগ্য এবং সাহস আজও তাহার হয় নাই। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র দোর্দণ্ড-প্রতাপ হেডমাস্টার পর্যন্ত যেরূপ তটস্থ হইয়া পড়েন, তাহাতে ছাত্রমহলে ভয় এবং বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না। ডাকা ত দূরের কথা ভরসা করিয়া ইহারা কেহ তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই পারে না। কিন্তু দিদির কাছে স্বীকার করাও ত সহজ নহে! ছেলেরা মাস্টারদিগকে 'ছোটবাবু' বলিয়া ডাকিতে শুনিয়াছিল। তাই সে বুদ্ধি খরচ করিয়া কহিল, আমরা ছোটবাবু বলি। কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া রমার বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না। সে ভাইকে আরও একটু বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সহাস্যে কহিল, ছোটবাবু কি রে! তিনি যে তোর দাদা হন। বেণীবাবুকে যেমন বড়দা বলে ডাকিস্, এঁকে তেমনি ছোটদা বলে ডাকতে পারিস নে?

বালক বিস্ময়ে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল -আমার দাদা হন তিনি? সত্যি বল্‌চ দিদি?

তাই ত হয় রে বলিয়া রমা আবার একটু হাসিল। আর যতীনকে ধরিয়া রাখা শক্ত হইয়া উঠিল! খবরটা সঙ্গীদের মধ্যে এখনি প্রচার করিয়া দিতে পারিলেই সে বাঁচে। কিন্তু ইস্কুল যে বন্ধ! এই দুটো দিন তাহাকে কোনমতে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতেই হইবে। তবে যে-সকল ছেলেরা কাছাকাছি থাকে অন্ততঃ তাহাদিগকে না বলিয়াই বা সে থাকে কি করিয়া! সে আর একবার ছটফট্ করিয়া বলিল, এখন যাব দিদি?

এত বেলায় কোথায় যাবি রে? বলিয়া রমা তাহাকে ধরিয়া রাখিল। যাইতে না পারিয়া যতীন খানিকক্ষণ অপ্রসন্নমুখে চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন দিদি?

রমা স্নিগ্ধস্বরে কহিল, এতদিন লেখাপড়া শিখতে বিদেশে ছিলেন। তুই বড় হলে তোকেও এমনি বিদেশে গিয়ে থাকতে হবে। আমাকে ছেড়ে পারবি

থাকতে যতীন? বলিয়া ভাইটিকে সে আর একবার বুকের কাছে আকর্ষণ করিল। বালক হইলেও সে তাহার দিদির কণ্ঠস্বরের কি-রকম একটা পরিবর্তন অনুভব করিয়া বিস্মিতভাবে মুখপানে চাহিয়া রহিল। কারণ, রমা তাহার এই ভাইটিকে প্রাণতুল্য ভালবাসিলেও তাহার কথায় এবং ব্যবহারে এরূপ আবেগ-উচ্ছ্বাস কখনও প্রকাশ পাইত না।

যতীন প্রশ্ন করিল, ছোটদার সমস্ত পড়া শেষ হয়ে গেছে দিদি?

রমা তেমনি স্নেহকোমলকণ্ঠে জবাব দিল, হাঁ ভাই, তাঁর সব পড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে।

যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, কি করে তুমি জানলে?

প্রত্যুত্তরে রমা শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মাথা নাড়িল। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে সে কিংবা গ্রামের আর কেহ কিছুই জানিত না। তাহার অনুমান যে সত্য হইবেই তাহাও নয়, কিন্তু কেমন করিয়া তাহার যেন নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল, যে ব্যক্তি পরের ছেলের লেখাপড়ার জন্য এই অত্যল্পকালের মধ্যেই এরূপ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, সে কিছুতেই নিজে মূর্খ নয়।

যতীন এ লইয়া আর জিদ করিল না! কারণ, ইতিমধ্যে হঠাৎ তাহার মাথার মধ্যে আর একটা প্রশ্নের আবির্ভাব হইতেই চট্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, আচ্ছা দিদি, ছোটদা কেন আমাদের বাড়ি আসেন না? বড়দা ত রোজ আসেন।

প্রশ্নটা ঠিক যেন একটা আকস্মিক তীক্ষ্ণ ব্যথার মত রমার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎবেগে প্রবাহিত হইয়া গেল। তথাপি হাসিয়া কহিল, তুই তাকে ডেকে আনতে পারিস্ নে?

এখনই যাব দিদি? বলিয়া তৎক্ষণাৎ যতীন উঠিয়া দাঁড়াইল।

ওরে, কি পাগল ছেলে রে তুই, বলিয়া রমা চক্ষের পলকে তাহার ভয়-ব্যাকুল দুই বাহু বাড়াইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। খবরদার যতীন—কখখনো এমন কাজ করিস নে ভাই, কখখনো না। বলিয়া ভাইটিকে সে যেন প্রাণপণ বলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। তাহার অতি দ্রুত হৃদস্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করিয়া যতীন বালক হইলেও এবার বড় বিস্ময়ে দিদির মুখপানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। একে ত এমনধারা করিতে কখনও সে পূর্বে দেখে নাই, তা ছাড়া ছোটবাবুকে ছোটদাদা বলিয়া জানিয়া যখন তাহার নিজের মনের গতি সম্পূর্ণ অন্যপথে গিয়াছে, তখন দিদি কেন যে তাঁহাকে এত ভয় করিতেছে, তাহা সে কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না। এমন সময়ে মাসির তীক্ষ্ণ আহ্বান কানে আসিতেই রমা যতীনকে ছাড়িয়া দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। অনতিকাল পরে তিনি স্বয়ং আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমি বলি বুঝি রমা ঘাটে চান করতে গেছে! বলি একাদশী বলে কি এতটা বেলা পর্যন্ত মাথায়

একটু তেল-জলও দিতে হবে না? মুখ শুকিয়ে যে একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেছে।

রমা জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, তুমি যাও মাসি, আমি এখন যাচ্ছি!

যাবি আর কখন? বেরিয়ে দেখ্‌গে যা, বেণীরা মাছ ভাগ করতে এসেচে।

মাছের নামে যতীন ছুটিয়া চলিয়া গেল! মাসির অলক্ষ্যে রমা আঁচল দিয়া মুখখানা একবার জোর করিয়া মুছিয়া লইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাঙ্গণের উপর মহা কোলাহল। মাছ নিতান্ত কম ধরা পড়ে নাই—একটা বড় ঝুড়ির প্রায় এক ঝুড়ি। ভাগ করিবার জন্য বেণী নিজেই হাজির হইয়াছেন! পাড়ার ছেলেমেয়েরা আর কোথাও নাই—সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতেছে।

কাসির শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই—'ক মাছ পড়ল হে বেণী? বলিয়া লাঠি হাতে ধর্মদাস প্রবেশ করিল।

তেমন আর কৈ পড়িল! বলিয়া বেণী মুখখানা অপ্রসন্ন করিল। জেলেকে ডাকিয়া কহিল, আর দেরি করচিস্ কেন রে? শীগ্‌গির করে দু ভাগ করে ফেল না।

জেলে ভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

কি হচ্চে গো রমা? অনেকদিন আসতে পারিনি। বলি, মায়ের আমার খবরটা একবার নিয়ে যাই, বলিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলী বাড়ি ঢুকিলেন।

আসুন, বলিয়া রমা মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল।

এত ভিড় কিসের গো?—বলিয়া গাঙ্গুলী অগ্রসর হইয়া আসিয়া হঠাৎ যেন আশ্চর্য হইয়া গেলেন বাস! তাইত গা, মাছ বড় মন্দ ধরা পড়েনি দেখচি। বড় পুকুরে জাল দেওয়া হ'ল বুঝি?

এ-সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সকলেই বাহুল্য মনে করিয়া মৎস্য-বিভাগের প্রতি ঝুঁকিয়া রহিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তা সমাধা হইয়া গেল। বেণী নিজের অংশের প্রায় সমস্তটুকুই চাকরের মাথায় তুলিয়া দিয়া ধীবরের প্রতি একটা চোখের ইঙ্গিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিল এবং মুখুয্যেদের উদ্যোগ করিল এবং মুখুয্যেদের প্রয়োজন অল্প বলিয়া রমার অংশ হইতে উপস্থিত সকলেই যোগ্যতানুসারে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সকলেই আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া দেখিল, রমেশ ঘোষালের সেই বেঁটে হিন্দুস্থানী চাকরটা তাহার মাথার সমান উঁচু বাঁশের লাঠি হাতে, একেবারে উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই লোকটার চেহারা এমনি দুশমনের মত যে, সকলের আগে সে চোখে পড়েই এবং একবার পড়িলেই মনে থাকে। গ্রামের ছেলে-বুড়া সবাই তাহাকে চিনিয়া লইয়াছিল; এমন কি, তাহার সম্বন্ধে

নানাবিধ আজগুবি গল্পও ধীরে ধীরে প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। লোকটা এত লোকের মাঝখানে রমাকেই যে কি করিয়া কর্ত্রী বলিয়া চিনিল তাহা সেই জানে, দূর হইতে মস্ত একটা সেলাম করিয়া 'মা-জী' বলিয়া সম্বোধন করিল এবং কাছে আসিয়া দাঁড়াইল! তাহার চেহারা যেমনই হোক, কণ্ঠস্বর সত্যই ভয়ানক—অত্যন্ত মোটা এবং ভাঙ্গা। আর একটা সেলাম করিয়া হিন্দী-বাঙ্গলা মেশানো ভাষায় সংক্ষেপে জানাইল, সে রমেশবাবুর ভৃত্য এবং মাছের তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। রমা বিস্ময়ের প্রভাবেই হোক, বা তাহার সঙ্গত প্রার্থনার বিরুদ্ধে কথা খুঁজিয়া না পাওয়ার জন্যই হোক সহসা উত্তর দিতে পারিল না। লোকটা চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া বেণীর ভৃত্যকে উদ্দেশ করিয়া গভীর গলায় বলিল, এই যাও মাৎ।

চাকরটা ভয়ে চার পা পিছাইয়া দাঁড়াইল। আধ-মিনিট পর্যন্ত কোথাও একটু শব্দ নাই, তখন বেণী সাহস করিল, যেখানে ছিল সেইখান হইতে বলিল, কিসের ভাগ?

ভজুয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে একটা সেলাম দিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, বাবুজী, আপকো নেহি পুছা।

মাসি অনেক দূরে রকের উপর হইতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া বলিলেন, কি রে বাপু মারবি না কি?

ভজুয়া একমুহূর্ত তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল; পরক্ষণে তাহার ভাঙ্গা গলার ভয়ঙ্কর হাসিতে বাড়ি ভরিয়া উঠিল। খানিক পরে হাসি থামাইয়া যেন একটু প্রায় লজ্জিত হইয়াই পুনরায় রমার প্রতি চাহিয়া কহিল, মা-জী? তাহার কথায় এবং ব্যবহারে অতিশয় সম্ভ্রমের ভিতরে যেন অবজ্ঞা লুকান ছিল, রমা ইহাই কল্পনা করিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এবার কথা কহিল। বলিল, কি চায় তোর বাবু?

রমার বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া ভজুয়া হঠাৎ যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাই যতদূর সাধ্য সেই কর্কশকণ্ঠ কোমল করিয়া তাহার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করিল। কিন্তু করিলে কি হয়—মাছ ভাগ হইয়া যে বিলি হইয়া গিয়াছে। এতগুলো লোকের সুমুখে রমা হীন হইতেও পারে না। তাই কটুকণ্ঠে কহিল, তোর বাবুর এতে কোন অংশ নেই। বল্‌গে যা, যা পারে তাই করুক গে।

বহুৎ আচ্ছা মা-জী। বলিয়া ভজুয়া তৎক্ষণাৎ একটা দীর্ঘ সেলাম করিয়া বেণীর ভৃত্যকে হাত নাড়িয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া দিল এবং দ্বিতীয় কথা না কহিয়া নিজেও প্রস্থানের উপক্রম করিল। তাহার ব্যবহারে বাড়িসুদ্ধ সকলেই যখন অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে, তখন হঠাৎ সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রমার মুখের দিকে চাহিয়া হিন্দি-বাঙ্গলায় মিশাইয়া নিজের কঠোর কণ্ঠস্বরের জন্য ক্ষমা চাহিল

এবং কহিল, মা-জী, লোকের কথা শুনিয়া পুকুরধার হইতে মাছ কাড়িয়া আনিবার জন্য বাবু আমাকে হুকুম করিয়াছিলেন। বাবুজী কিংবা আমি কেহই আমরা মাছ-মাংস ছুঁই না বটে, কিন্তু—বলিয়া সে নিজের প্রশস্ত বুকের উপর করাঘাত করিয়া কহিল, বাবুজীর হুকুমে এই জীউ হয়ত পুকুরধারেই আজ দিতে হইত। কিন্তু রামজী রক্ষা করিয়াছেন ; বাবুজীর রাগ পড়িয়া গেল। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, ভজুয়া, যা মা-জীকে জিজ্ঞেস করে আয় ও পুকুরে আমার ভাগ আছে কি না, বলিয়া সে অতি সম্ভ্রমের সহিত লাঠিসুদ্ধ দুই হাত রমার প্রতি উত্থিত করিয়া নিজের মাথায় ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, বাবুজী বলিয়া দিলেন আর যে যাই বলুক ভজুয়া, আমি নিশ্চয় জানি মা-জীর জবান থেকে কখনও ঝুটা বাত বার হবে না সে কখনও পরের জিনিস ছোঁবে না, বলিয়া সে আন্তরিক সম্ভ্রমের সহিত বারংবার নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

যাইবামাত্র বেণী মেয়েলি সরু গলায় আস্ফালন করিয়া কহিল, এমনি করে উনি বিষয় রক্ষে করবেন। এই তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞে করছি, আমি আজ থেকে গড়ের একটা শামুক-গুগলিতেও ওকে হাত দিতে দেব না, বুঝলে না রমা, বলিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া হিঃ—হিঃ করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

রমার কানে কিন্তু ইহার একটা কথাও প্রবেশ করিল না। মা-জীর মুখ হইতে কখনো ঝুটা বাত বাহির হইবে না—ভজুয়ার এই বাক্যটা তখন তাহার দুই কানের ভিতর লক্ষ করতালির সমবেত ঝমাঝম শব্দে যেন মাথাটা ছেঁচিয়া ফেলিতেছিল। তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি পলকের জন্য রাঙা হইয়াই এমনি সাদা হইয়া গিয়াছিল যেন কোথাও একফোঁটা রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। শুদ্ধ এই জ্ঞানটা তাহার ছিল, যেন এ মুখের চেহারাটা কাহারাও চোখে না পড়ে। তাই সে মাথার আঁচলটা আর একটু টানিয়া দিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

॥ আট ॥

জ্যাঠাইমা।

কে, রমেশ? আয় বাবা, ঘরে আয়। বলিয়া আহ্বান করিয়া বিশ্বেশ্বরী তাড়াতাড়ি একখানি মাদুর পাতিয়া দিলেন। ঘরে পা দিয়াই রমেশ চমকিত হইয়া উঠিল। কারণ, জ্যাঠাইমার কাছে যে স্ত্রীলোকটি বসিয়াছিল তাহার মুখ দেখিতে না পাইলেও বুঝিল এ রমা। তাহার ভারি একটা চিত্তজ্বালার সহিত মনে হইল, ইহারা মাসিকে মাঝখানে রাখিয়া অপমান করিতেও ত্রুটি করে না, আবার নিতান্ত নির্লজ্জার মত নিভৃতে কাছে আসিয়াও বসে। এদিকে রমেশের আকস্মিক অভ্যাগমে রমার অবস্থাসংকট কম হয় নাই। কারণ, শুধু যে সে এ

গ্রামের মেয়ে তাই নয়, রমেশের সহিত তাহার সম্বন্ধটাও এইরূপ যে, নিতান্ত অপরিচিতার মত ঘোমটা টানিয়া দিতেও লজ্জা করে, না দিয়াও সে স্বস্তি পায় না। তা ছাড়া মাছ লইয়া এই যে সেদিন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তাই সর্বদিক বাঁচাইয়া যতটা পারা যায় সে আড় হইয়া বসিয়াছিল, রমেশ আর সেদিকে চাহিল না। ঘরে যে আর কেহ আছে, তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া ধীরে-সুস্থে মাদুরের উপর উপবেশন করিয়া কহিল, জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা বলিলেন, হঠাৎ এমন দুপুরবেলা যে, রমেশ?

রমেশ কহিল, দুপুরবেলা না এলে তোমার কাছে যে একটু বসতে পাইনে। তোমার কাজ ত কম নয়!

জ্যাঠাইমা তাহার প্রতিবাদ না করিয়া শুধু একটুখানি হাসিলেন। রমেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, বহুকাল আগে ছেলেবেলায় একবার তোমার কাছে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলুম। আবার আজ একবার নিতে এলুম। এই হয়ত শেষ নেওয়া জ্যাঠাইমা!

তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও কণ্ঠস্বরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ের এমনই একটা গভীর অবসাদ প্রকাশ পাইল যে, উভয়েই বিস্মিত ব্যথায় চমকিয়া উঠিলেন।

বালাই ষাট! ও কি কথা বাপ। বলিয়া বিশ্বেশ্বরীর চোখ-দুটি যেন ছলছল করিয়া উঠিল।

রমেশ শুধু একটু হাসিল।

বিশ্বেশ্বরী স্নেহার্দ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, শরীরটা কি এখানে ভাল থাকচে না—বাবা?

রমেশ নিজের সুদীর্ঘ এবং অত্যন্ত বলশালী দেহের পানে বার-দুই দৃষ্টি-পাত করিয়া বলিল, এ যে খোট্টার দেশের ডাল-রুটির দেহ জ্যাঠাইমা, এ কি এত শীঘ্রই খারাপ হয়? তা নয়, শরীর আমার বেশ ভালই আছে, কিন্তু এখানে আমি আর একদণ্ড টিকতে পাচ্ছিনে, সমস্ত প্রাণটা যেন আমার থেকে থেকে খাবি খেয়ে উঠচে।

শরীর খারাপ হয় নাই শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী নিশ্চিন্ত হইয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই তোর জন্মস্থান—এখানে টিঁকতে পারছিস নে কেন বল দেখি?

রমেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, সে আমি বলতে চাইনে। আমি জানি তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত জান।

বিশ্বেশ্বরী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, সব না জানলেও কতক জানি বটে। কিন্তু সেই জন্যই ত বলচি, তোর আর কোথাও গেলে চলবে না রমেশ।

রমেশ কহিল, কেন চলবে না জ্যাঠাইমা? কেউ ত এখানে আমাকে চায় না।

জ্যাঠাইমা বলিলেন, চায় না বলেই ত তোকে আর কোথাও পালিয়ে যেতে আমি দেব না। এই যে ডাল-রুটি খাওয়া দেহের বড়াই করছিলি রে, সে কি পালিয়ে যাবার জন্যে?

রমেশ চুপ করিয়া রহিল, আজ কেন যে তাহার সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া গ্রামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার একটু বিশেষ কারণ ছিল। গ্রামের যে পথটা বরাবর স্টেশনে গিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহার একটা জায়গা আট-দশ বৎসর পূর্বে বৃষ্টির জল-স্রোতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সেই অবধি ভাঙ্গনটা ক্রমাগত দীর্ঘতর এবং গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে—প্রায়ই জল জমিয়া থাকে—স্থানটা উত্তীর্ণ হইতে সকলকেই একটু দুর্ভাবনায় পড়িতে হয়। অন্য সময়ে কোনমতে পা টিপিয়া, কাপড় তুলিয়া, অতি সন্তর্পণে ইহারা পার হয়, কিন্তু বর্ষা-কালে আর কষ্টের অবধি থাকে না। কোন বছর বা দুটো বাঁশ ফেলিয়া দিয়া, কোন বছর বা একটা ভাঙ্গা তালের ডোঙ্গা উপুড় করিয়া দিয়া, কোনমতে তাহারই সাহায্যে ইহারা আছাড় খাইয়া, হাত-পা ভাঙ্গিয়া ওপারে গিয়া হাজির হয়। কিন্তু এত দুঃখ সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা আজ পর্যন্ত তাহার সংস্কারের চেষ্টা-মাত্র করে নাই। মেরামত করিতে টাকা-কুড়ি ব্যয় হওয়া সম্ভব। এই টাকাটা রমেশ নিজে না দিয়া চাঁদা তুলিবার চেষ্টায় আট-দশদিন পরিশ্রম করিয়াছে; কিন্তু আট-দশটা পয়সা কাহারো কাছে বাহির করিতে পারে নাই। শুধু তাই নয়—আজ সকালে ঘুরিয়া আসিবার সময় পথের ধারে সেকরাদের দোকানের ভিতরে এই প্রসঙ্গ হঠাৎ কানে যাওয়ায় সে বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইল, কে একজন আর একজনকে হাসিয়া বলিতেছে, একটা পয়সা কেউ তোরা দিসনে। দেখছিস নে, ওর নিজের গরজটাই বেশি। জুতো পায়ে মস্‌মসিয়ে চলা চাই কিনা! না দিলেও আপনি সারিয়ে দেবে তা দেখিস! তা ছাড়া এতকাল যে ও ছিল না, আমাদের ইস্টিশান যাওয়া কি আটকে ছিল?

কে আর-একজন কহিল, সবুর কর না হে! চাটুয্যেমশায় বলছিলেন, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে শীতলাঠাকুরের ঘরটাও ঠিকঠাক করে নেওয়া হবে। খোশা-মোদ করে দুটো বাবু করতে পারলেই ব্যস।—তখন হইতে সারা সকালবেলাটা এই দুটো কথা তাহাকে যেন আগুন দিয়া পোড়াইতেছিল।

জ্যাঠাইমা ঠিক এই স্থানটাতেই ঘা দিলেন। বলিলেন, সে ভাঙ্গনটা যে সারাবার চেষ্টা করছিলি তার কি হল?

রমেশ বিরক্ত হইয়া কহিল, সে হবে না জ্যাঠাইমা—কেউ একটা পয়সা চাঁদা দেবে না।

বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, দেবে না বলে কি হবে না রে? তোর দাদা-মশায়ের ত তুই অনেক টাকা পেয়েছিস—এই ক'টা টাকা তুই ত নিজেই দিতে পারিস্।

রমেশ একেবারে আগুন হইয়া উঠিল, কহিল, কেন দেব? আমার ভারী দুঃখ হচ্ছে যে, না বুঝে অনেকগুলো টাকা এদের ইস্কুলের জন্যে খরচ করে ফেলেচি। এ গাঁয়ের কারো জন্যে কিছু করতে নেই। রমার দিকে একবার কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া বলিল, এদের দান করলে এরা বোকা মনে করে, ভাল করলে গরজ ঠাওরায়, ক্ষমা করাও মহাপাপ, ভাবে ভয়ে পেছিয়ে গেল।

জ্যাঠাইমা খুব হাসিয়া উঠিলেন; কিন্তু রমার চোখ-মুখ একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। রমেশ রাগ করিয়া কহিল, হাসলে যে জ্যাঠাইমা?

না হেসে করি কি বল্ত বাছা? বলিয়া সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বরং আমি বলি, তোরই এখানে থাকা সবচেয়ে দরকার। রাগ করে যে জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে যাচ্ছিস্ রমেশ, বল দেখি তোর রাগের যোগ্য লোক এখানে আছে কে? একটু থামিয়া কতকটা যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, আহা, এরা যে কত দুঃখী, কত দুর্বল—তা যদি জানিস রমেশ, এদের উপর রাগ করতে তোর আপনি লজ্জা হবে। ভগবান যদি দয়া করে তোকে পাঠিয়েচেন—তবে এদের মাঝখানেই তুই থাক বাবা।

কিন্তু এরা যে আমাকে চায় না জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা বলিলেন, তাই থেকেই কি বুঝতে পারিস নে বাবা, এরা তোর রাগ অভিমানের কত অযোগ্য? আর শুধু এরাই নয়—যে গ্রামে ইচ্ছে ঘুরে আয়, দেখবি সমস্তই এক।

সহসা রমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি যে সেই থেকে ঘাড় হেঁট করে চুপ করে বসে আছ মা? হ্যাঁ রমেশ, তোরা দু'ভাই-বোন কি কথাবার্তা বলিস নে?—না মা, সে ক'রো না। ওর বাপের সঙ্গে তোমাদের যা হয়ে গেছে সে ঠাকুরপোর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। সে নিয়ে তোমরা দু'জন মনান্তর করে থাকলে ত কিছুতেই চলবে না।

রমা মুখ নীচু করিয়াই আস্তে আস্তে বলিল, আমি মনান্তর রাখতে চাইনে জ্যাঠাইমা। রমেশদা

অকস্মাৎ তাহার মৃদুকণ্ঠ রমেশের গম্ভীর উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে ঢাকিয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এর মধ্যে তুমি কিছুতে থেকো না জ্যাঠাইমা। সেদিন কোন গতিকে ওঁর মাসির হাতে প্রাণে বেঁচেছ, আজ আবার উনি গিয়ে যদি তাঁকে পাঠিয়ে দেন—একেবারে তোমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে তবে তিনি বাড়ি ফিরবেন, বলিয়াই কোনরূপ বাদ-প্রতিবাদের অপেক্ষামাত্র না করিয়াই দ্রুত-পদে বাহির হইয়া গেল।

বিশ্বেশ্বরী চেঁচাইয়া ডাকিলেন, যাসনে রমেশ, কথা শুনে যা।

রমেশ দ্বারের বাহির হইতে বলিল, না জ্যাঠাইমা; যারা অহংকারের স্পর্ধায়

তোমাকে পর্যন্ত পায়ের তলায় মাড়িয়ে চলে তাদের হয়ে একটি কথাও তুমি ব'লো না, বলিয়া তাহার দ্বিতীয় অনুরোধের পূর্বেই চলিয়া গেল।

বিহ্বলের মত রমা কয়েক মুহূর্ত বিশ্বেশ্বরীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—এ কলহ আমার কেন জ্যাঠাইমা? আমি কি মাসিকে শিখিয়ে দিই, না তার জন্য আমি দায়ী?

জ্যাঠাইমা তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া সস্নেহে বলিলেন, শিখিয়ে যে দাও না এ কথা সত্যি। কিন্তু তার জন্য দায়ী তোমাকে কতকটা হতে হয় বৈ কি মা!

রমা অন্য হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধ অভিমানে সতেজে অস্বীকার করিয়া বলিল, কেন দায়ী? কখ্‌খনো না। আমি যে এর বিন্দু-বিসর্গও জানতাম না জ্যাঠাইমা! তবে কেন আমাকে উনি মিথ্যে দোষ দিয়ে অপমান করে গেলেন?

বিশ্বেশ্বরী ইহা লইয়া আর তর্ক করিলেন না। ধীরভাবে বলিলেন, সকলে ত ভেতরের কথা জানতে পারে না মা। কিন্তু তোমাকে অপমান করবার ইচ্ছে ওর কখনো নেই, এ কথা তোমাকে আমি নিশ্চয় বলতে পারি। তুমি ত জান না মা, কিন্তু আমি গোপাল সরকারের মুখে শুনে টের পেয়েচি, তোমার ওপর ওর কত শ্রদ্ধা, কত বিশ্বাস; সেদিন তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে দু'ঘরে যখন ভাগ করে নিলে, তখনও কারো কথায় কান দেয়নি যে ওর তাতে অংশ ছিল। তাদের মুখের ওপর হেসে বলেছিল, চিন্তার কারণ নেই—রমা যখন আছে তখন আমার ন্যায্য অংশ আমি পাবই; সে কখনো পরের জিনিস আত্মসাৎ করবে না। আমি ঠিক জানি মা, এত বিবাদ-বিসংবাদের পরেও তোমার ওপর ওর সেই বিশ্বাসই ছিল যদি না সেদিন গড়পুকুরের—

কথাটার মাঝখানেই বিশ্বেশ্বরী সহসা থামিয়া গিয়া নির্নিমেষ-চক্ষে কিছুক্ষণ ধরিয়া রমার আরক্ত শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, আর একটা কথা বলি মা তোমাকে, বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করার দাম যতই হোক রমা, এই রমেশের প্রাণটার দাম তার চেয়ে অনেক বেশি। কারো কথায়, কোন বস্তুর লোভেতেই মা সেই জিনিসটিকে তোমরা চারিদিক থেকে ঘা মেরে নষ্ট করে ফেলো না। দেশের যে ক্ষতি তাতে হবে, আমি নিশ্চয় বলচি তোমাকে, কোন কিছু দিয়েই আর তার পূরণ হবে না।

রমা স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, একটি কথারও প্রতিবাদ করিল না। বিশ্বেশ্বরী আর কিছু বলিলেন না। খানিক পরে রমা অস্পষ্ট মৃদুকণ্ঠে কহিল, বেলা গেল, আজ বাড়ি যাই জ্যাঠাইমা, বলিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া চলিয়া গেল।

॥ নয় ॥

যত রাগ করিয়াই রমেশ চলিয়া আসুক, বাড়ি পেঁছিতে না পেঁছিতে তাহার সমস্ত উত্তাপ যেন জল হইয়া গেল। সে বার বার করিয়া বলিতে লাগিল—এই সোজা কথাটা না বুঝিয়া কি কষ্টই না পাইতেছিলাম। বাস্তবিক, রাগ করি কাহার উপর? যাহারা এতই সংকীর্ণভাবে স্বার্থপর যে, যথার্থ মঙ্গল কোথায়, তাহা চোখ মেলিয়া দেখিতেই জানে না, শিক্ষার অভাবে যাহারা এমনি অন্ধ যে, কোনমতে প্রতিবেশীর বলক্ষয় করাটাকেই নিজেদের বল-সঞ্চয়ের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করে, যাহাদের ভাল করিতে গেলে সংশয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে, তাহাদের উপর অভিমান করার মত ভ্রম আর ত কিছুই হইতে পারে না। তাহার মনে পড়িল, দূরে শহরে বসিয়া সে বই পড়িয়া, কানে গল্প শুনিয়া, কল্পনা করিয়া কতবার ভাবিয়াছে—আমাদের বাঙ্গালী জাতির আর কিছু যদি না থাকে ও নিভৃত গ্রামগুলিতে সেই শান্তি-স্বচ্ছন্দতা আজও আছে, যাহা বহুজনাকীর্ণ শহরে নাই। সেখানে স্বল্পে সন্তুষ্ট সরল গ্রামবাসীরা সহানুভূতিতে গলিয়া যায়, একজনেব দুঃখে আর একজন বুক দিয়া আসিয়া পড়ে, একজনের সুখে আর একজন অনাহূত উৎসব করিয়া যায়। শুধু সেইখানে, সেই সব হৃদয়ের মধ্যেই এখনো বাঙ্গালীব সত্যকাব ঐশ্বর্য অক্ষয় হইয়া আছে। হায় বে! এ কি ভয়ানক ভ্রান্তি! তাহার শহরের মধ্যেও যে এমন বিবোধ, এই পবশ্রীকাতরতা চোখে পড়ে নাই। নগরের সজীব-চঞ্চল পথেব ধারে যখনই কোন পাপের চিহ্ন তাহার চোখে পড়িয়া গিয়াছে, তখনই সে মনে করিয়াছে, কোনমতে তাহার জন্মভূমি সেই ছোট্ট গ্রামখানিতে গিয়া পড়িলে সে এই-সকল দৃশ্য হইতে চিরদিনের মত রেহাই পাইয়া বাঁচিবে। সেখানে যাহা সকলের বড়—সেই ধর্ম আছে এবং সামাজিক চরিত্রও আজিও সেখানে অক্ষুণ্ণ হইয়া বিবাজ কবিতেছে। হা ভগবান! কোথায় সেই চবিত্র? কোথায় সেই জীবন্ত ধর্ম আমাদের এই-সমস্ত প্রাচীন নিভৃত গ্রামগুলিতে? ধর্মেব প্রাণটাই যদি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছ, তাহার মৃতদেহটাকে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন? এই বিবর্ণ বিকৃত শবদেহটাকেই হতভাগা গ্রাম্য সমাজ যে যথার্থ ধর্ম বলিয়া প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিযা তাহারই বিশাক্ত পূতিগন্ধময় পিচ্ছিলতায় অহর্নিশি অধঃপথেই নামিযা চলিতেছে। অথচ সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক পরিহাস এই যে, জাতিধর্ম নাই বলিয়া শহবেব প্রতি ইহাদের অবজ্ঞা অশ্রদ্ধারও অন্ত নাই।

রমেশ বাড়িতে পা দিতেই দেখিল, প্রাঙ্গণের একধারে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক একটি এগার-বারো বছরের ছেলেকে লইয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। কিছু না জানিয়া শুধু ছেলেটির মুখ দেখিয়াই রমেশের বুকের ভিতরটা যেন কাঁদিয়া উঠিল। গোপাল সরকার চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া

লিখিতেছিল ; উঠিয়া আসিয়া কহিল, ছেলেটি দক্ষিণপাড়ার দ্বারিক ঠাকুরের ছেলে। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষার জন্য এসেচে।

ভিক্ষার নাম শুনিয়া রমেশ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, আমি কি শুধু ভিক্ষা দিতেই বাড়ি এসেছি সরকারমশাই ? গ্রামে কি আর লোক নেই ?

গোপাল সরকার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, সে ঠিক কথা বাবু ! কিন্তু কর্তা ত কখনও কারুকে ফেরাতেন না ; তাই দায়ে পড়লেই এই বাড়ির দিকেই লোকে ছুটে আসে।

ছেলেটির পানে চাহিয়া প্রৌঢ়াটিকেই উদ্দেশ করিয়া বলিল, হাঁ কামিনীর মা, এদের দোষও ত কম নয় বাছা ! জ্যান্ত থাকতে প্রায়শ্চিত্ত করে দিলে না, এখন মড়া যখন ওঠে না, তখন টাকার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছ ! ঘরে ঘটিটা-বাটিটাও কি নেই বাপু ?

কামিনীর মা জাতিতে সদ্‌গোপ, এই ছেলেটির প্রতিবেশী। মাথা নাড়িয়া বলিল, বিশ্বেস না হয় বাপু, গিয়ে দেখবে চল। আর কিছু থাকলেও কি মরা-বাপ ফেলে একে ভিক্ষে করতে আনি। চোখে না দেখলেও শুনেচ ত সব ? এই ছ মাস ধরে আমার যথাসর্বস্ব এই জন্যই ঢেলে দিয়েচি। বলি, ঘরের পাশে বামুনের ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে মরবে।

রমেশ এই ব্যাপারটা কতক যেন অনুমান করিতে পারিল। গোপাল সরকার তখন বুঝাইয়া কহিল, এই ছেলেটির বাপ—দ্বারিক চক্রবর্তী ছয় মাস হইতে কাসরোগে শয্যাগত থাকিয়া আজ ভোরবেলায় মরিয়াছে ; প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই বলিয়া কেহ শব স্পর্শ করিতে চাহিতেছে না—এখন সেইটা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কামিনীর মা গত ছয়মাস কাল তাহার সর্বস্ব এই নিঃস্ব ব্রাহ্মণ-পরিবারের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে ; আজ তাহারও কিছু নাই। সেজন্যে ছেলেটিকে লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছে।

রমেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেলা ত প্রায় দুটো বাজে। যদি প্রায়শ্চিত্ত না হয়, মড়া পড়েই থাকবে ?

সরকার হাসিয়া কহিল, উপায় কি বাবু ? অশাস্তর কাজ ত আর হতে পারে না। আর এতে পাড়ার লোককেই বা দোষ দেবে কে বলুন -যা হোক, মড়া পড়ে থাকবে না ; যেমন করে হোক, কাজটা ওদের করতেই হবে। তাই ত ভিক্ষে - হাঁ কামিনীর মা, আর কোথাও গিয়েছিলে ?

ছেলেটি মুঠা খুলিয়া একটি সিকি ও চারিটি পয়সা দেখাইল। কামিনীর মা কহিল, সিকিটি মুখুয্যেরা দিয়েচে, আর পয়সা চারিটি হালদারমশাই দিয়েচেন ! কিন্তু যেমন করেই হোক ন'সিকের কমে ত হবে না। তাই, বাবু যদি—

রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল, তোমরা বাড়ি যাও বাপু, আর কোথাও যেতে হবে না। আমি এখনি সমস্ত বন্দোবস্ত করে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাদের বিদায়

করিয়া দিয়া রমেশ গোপাল সরকারের মুখের প্রতি অত্যন্ত ব্যথিত দুই চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিল, এমন গরীব এ-গাঁয়ে আর কয় ঘর আছে জানেন আপনি ?

সরকার কহিল, দু-তিন ঘর আছে, বেশি নেই। এদেরও মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান ছিল বাবু শুধু একটা চালতা গাছ নিয়ে মামলা করে দ্বারিক চক্কোত্তি আর সনাতন হাজরা, দু-ঘরই বছর-পাঁচেক আগে শেষ হয়ে গেল। গলাটা একটু খাটো করিয়া কহিল, এতদূর গড়াত না বাবু, শুধু আমাদের বড়বাবু আর গোবিন্দ গাঙ্গুলী দুজনকেই নাচিয়ে তুলে এতটা করে তুললেন।

তারপরে ?

সরকার কহিল, তারপর আমাদের বড়বাবুর কাছেই দু-ঘরের গলা পর্যন্ত এতদিন বাঁধা ছিল। গত বৎসর উনি সুদে-আসলে সমস্তই কিনে নিয়েচেন। হাঁ, চাষার মেয়ে বটে ওই কামিনীর মা। অসময়ে বামুনের যা করলে এমন দেখতে পাওয়া যায় না।

রমেশ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপর গোপাল সরকারকে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া মনে মনে বলিল, তোমার আদেশই মাথায় তুলে নিলাম জ্যাঠাইমা! মরি এখানে সেও ঢের ভালো কিন্তু এ দুর্ভাগা গ্রামকে ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাইব না।

॥ দশ ॥

মাস-তিনেক পরে একদিন সকালবেলা তারকেশ্বরের যে পুষ্করিণীটিকে দুধ-পুকুর বলে, তাহারই সিঁড়ির উপর একটি রমণীর সহিত রমেশের একেবারে মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। ক্ষণকালের জন্য সে এমনি অভিভূত হইয়া অভদ্রভাবে তাহার অনাবৃত মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল যে, তৎক্ষণাৎ পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইবার কথা মনে হইল না। মেয়েটির বয়স বোধ করি কুড়ির অধিক নয়। স্নান করিয়া উপরে উঠিতেছিল। তাড়াতাড়ি হাতের জলপূর্ণ ঘটিটি নামাইয়া রাখিয়া সিক্ত বসনতলে দুই বাহু বুকের উপর জড় করিয়া মাথা হেঁট করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আপনি এখানে যে ?

রমেশের বিস্ময়ের অবধি ছিল না; কিন্তু তাহার বিহ্বলতা ঘুচিয়া গেল। এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আমাকে চেনেন ?

মেয়েটি কহিল, চিনি। আপনি কখন তারকেশ্বরে এলেন ?

রমেশ কহিল, আজই ভোরবেলা। আমার মামার বাড়ি থেকে মেয়েদের আসবার কথা ছিল, কিন্তু তারা আসেননি।

এখানে কোথায় আছেন ?

রমেশ কহিল, কোথাও না। আমি আর কখনো এখানে আসিনি। কিন্তু আজকের দিনটা কোনমতে কোথাও অপেক্ষা করে থাকতেই হবে। সেখানে হোক একটা আশ্রয় খুঁজে নেব।

সঙ্গে চাকর আছে ত?

না, আমি একাই এসেছি।

বেশ যা হোক, বলিয়া মেয়েটি হাসিয়া হঠাৎ মুখ তুলিতেই আবার দুজনের চোখাচোখি হইল। সে চোখ নামাইয়া লইয়া মনে মনে বোধ করি একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিল, তবে আমার সঙ্গেই আসুন; বলিয়া ঘটিটি তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল।

রমেশ বিপদে পড়িল। কহিল, আমি যেতে পারি, কেননা, এতে দোষ থাকলে আপনি কখনই ডাকতেন না। আপনাকে আমি যে চিনি না, তাও নয়, কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পাচ্ছিনে। আপনার পরিচয় দিন।

তবে মন্দিরের বাইরে একটু অপেক্ষা করুন, আমি পুজোটা সেরে নিই। পথে যেতে যেতে আমার পরিচয় দেব, বলিয়া মেয়েটি মন্দিরের দিকে চলিয়া গেল। রমেশ মুগ্ধের মতো চাহিয়া রহিল। এ কি ভীষণ উদ্দাম যৌবনশ্রী ইহার আর্দ্র বসন বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল; তাহার মুখ, গঠন, প্রতি পদক্ষেপ পর্যন্ত রমেশের পরিচিত; অথচ বহুদিন-রুদ্ধ স্মৃতির কবাট কোনমতেই তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল না।

আধঘণ্টা পরে পুজা সারিয়া মেয়েটি আবার যখন বাহিরে আসিল, রমেশ আর একবার তাহার মুখ দেখিতে পাইল; কিন্তু তেমনই অপরিচয়ের দুর্ভেদ্য প্রাকারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। পথে চলিতে চলিতে রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে আপনার আত্মীয় কেউ নেই?

মেয়েটি উত্তর দিল, না। দাসী আছে, সে বাসায় কাজ করচে। আমি প্রায়ই এখানে আসি, সমস্ত চিনি।

কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া পথ চলিবার পরে বলিল, নইলে আপনার খাওয়া-দাওয়ার ভারী কষ্ট হ'ত। আমি রমা।

সম্মুখে বসিয়া আহার করাইয়া পান দিয়া বিশ্রামের জন্য নিজের হাতে সতরঞ্চি পাতিয়া দিয়া রমা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। সেই শয্যায় শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া রমেশের মনে হইল, তাহার এই তেইশ বর্ষব্যাপী জীবনটা এই একটা বেলার মধ্যে যেন আগাগোড়া বদলাইয়া গেল। ছেলেবেলা হইতেই তাহার বিদেশে পরাশ্রয়ে কাটিয়াছে। খাওয়াটার মধ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তির অধিক আর কিছু যে কোন অবস্থাতেই থাকিতে পারে ইহা সে জানিতই না। তাই আজিকার এই

অচিন্তনীয় পরিতৃপ্তির মধ্যে তাহার সমস্ত মন বিস্ময়ে মাধুর্যে একেবারে ডুবিয়া গেল। রমা বিশেষ কিছুই এখানে তাহার আহারের জন্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই! নিতান্ত সাধারণ ভোজ্য ও পেয় দিয়া তাহাকে খাওয়াইতে হইয়াছে। এইজন্য তাহার বড় ভাবনা ছিল পাছে তাহার খাওয়া না হয় এবং পরের কাছে নিন্দা হয়। হায় রে পর! হায় রে তাদের নিন্দা! খাওয়া না হইবার দর্ভাবনা যে তাহার নিজের কত আপনার এবং সে যে তাহার অন্তরের অন্তরতম গহ্বর হইতে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়া তাহার সর্ববিধ দ্বিধা-সংকোচ সজোরে ছিনাইয়া লইয়া, এই খাওয়ার জায়গায় তাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল, এ কথা কেমন করিয়া আজ সে তাহার নিজের কাছে লুকাইয়া রাখিবে! আজ ত কোন লজ্জার বাধাই তাহাকে দূরে রাখিতে পারিল না! এই আহার্যের স্বল্পতার ত্রুটি যত্ন দিয়া পূর্ণ করিয়া লইবার জন্যই সে সুমুখে আসিয়া বসিল। আহার নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেলে গভীর পরিতৃপ্তির যে নিশ্বাসটুকু রমার নিজের বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহা রমেশের নিজের চেয়েও কত বেশি, তাহা আর কেহ যদি না জানিল, যিনি সব জানেন তাঁহার কাছে ত গোপন রহিল না।

দিবানিদ্রা রমেশের অভ্যাস ছিল না। তাহার সুমুখের ছোট জানালার বাহিরে নববর্ষার ধূসর শ্যামল মেঘে মধ্যাহ্ন-আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছিল। অর্ধ-নিমীলিত চক্ষে সে তাহাই দেখিতেছিল। তাহার আত্মীয়গণের আসা না-আসার কথা আর তাহার মনেই ছিল না। হঠাৎ রমার মৃদুকণ্ঠ তাহার কানে গেল। সে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল, আজ যখন বাড়ি যাওয়া হবে না, তখন এইখানেই থাকুন।

রমেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, কিন্তু যাঁর বাড়ি তাঁকে এখনো ত দেখতে পেলাম না। তিনি না বললে থাকি কি করে?

রমা সেইখানে দাঁড়াইয়া প্রত্যুত্তর করিল, তিনি বলচেন থাকতে। এ বাড়ি আমার।

রমেশ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, এ স্থানে বাড়ি কেন?

রমা বলিল, এ স্থানটা আমার খুব ভাল লাগে। প্রায়ই এসে থাকি। এখন লোক নেই বটে, কিন্তু এমন সময় সময় হয় যে, পা বাড়াবার জায়গা থাকে না।

রমেশ কহিল, বেশ ত, তেমন সময় নাই এলে?

রমা নীরবে একটু হাসিল। রমেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তারকনাথ ঠাকুরের উপর বোধ করি তোমার খুব ভক্তি, না?

রমা বলিল, তেমন ভক্তি আর কৈ? কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি চেষ্টা করতে হবে ত!

রমেশ আর কোন প্রশ্ন করিল না। রমা সেইখানেই চৌকাঠ ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িয়া অন্য কথা পাড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রে আপনি কি খান?

রমেশ হাসিয়া কহিল, যা জোটে তাই খাই। আমার খেতে বসবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কখনো খাবার কথা মনে হয় না। তাই বামুনঠাকুরের বিবেচনার উপরেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

রমা কহিল, এত বৈরাগ্য কেন?

ইহা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ কিংবা সরল পরিহাস মাত্র, তাহা রমেশ ঠিক বুঝিতে পারিল না। সংক্ষেপে জবাব দিল, না। এ শুধু আলস্য।

কিন্তু পরের কাজে ত আপনার আলস্য দেখিনে?

রমেশ কহিল, তার কারণ আছে। পরের কাজে আলস্য করলে ভগবানের কাছে জবাবদিহিতে পড়তে হয়। নিজের কাজেও হয়ত হয়, কিন্তু নিশ্চয়ই অত নয়।

রমা একটুখানি মৌন থাকিয়া কহিল, আপনার টাকা আছে, তাই আপনি পরের কাজে মন দিতে পারেন, কিন্তু যাদের নেই?

রমেশ বলিল, তাদের কথা জানিনে রমা। কেননা, টাকা থাকারও কোন পরিমাণ নেই, মন দেবারও কোন ধরাবাঁধা ওজন নেই। টাকা থাকা না-থাকার হিসেব তিনিই জানেন যিনি ইহ-পরকালের ভার নিয়েচেন।

রমা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু পরকালের চিন্তা করবার বয়স ত আপনার হয়নি। আপনি আমার চেয়ে শুধু তিন বছরের বড়।

রমেশ হাসিয়া বলিল, তার মানে তোমার আরও হয়নি। ভগবান তাই করুন, তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাক, কিন্তু আমি নিজের সম্বন্ধে আজই যে আমার শেষ দিন নয়, এ কথা কখনও মনে করিনে।

তাহার কথার মধ্যে যেটুকু প্রচ্ছন্ন আঘাত ছিল, তাহা বোধ করি বৃথা হয় নাই। একটুখানি স্থির থাকিয়া রমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, আপনাকে সন্ধ্যে-আহ্নিক করতে ত দেখলুম না! মন্দিরের মধ্যে কি আছে না আছে, তা না হয় নাই দেখলেন, কিন্তু খেতে বসে গণ্ডূষ করাটাও কি ভুলে যাচ্ছেন?

রমেশ মনে মনে হাসিয়া বলিল, ভুলিনি বটে, কিন্তু ভুললেও কোন ক্ষতি বিবেচনা করিনে। কিন্তু এ কথা কেন?

রমা বলিল, পরকালের ভাবনাটা আপনার খুব বেশি কিনা, তাই জিজ্ঞেসা করচি।

রমেশ ইহার জবাব দিল না। তাহার পর কিছুক্ষণ দুইজনে চুপ করিয়া রহিল। রমা আস্তে আস্তে বলিল, দেখুন আমাকে দীর্ঘজীবী হতে বলা শুধু অভিশাপ দেওয়া। আমাদের হিন্দুর ঘরে বিধবার দীর্ঘজীবন কোন আত্মীয় কোনদিন কামনা করে না। বলিয়া আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমি মরবার জন্যে যে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি তা সত্যি নয় বটে, কিন্তু বেশি-দিন বেঁচে থাকবার কথা মনে হলেও আমাদের ভয় হয়। কিন্তু আপনার সম্বন্ধেও

ত সে কথা খাটে না। আপনাকে জোর করে কোনও কথা বলা আমার পক্ষে প্রগল্‌ভতা; কিন্তু সংসারে ঢুকে যখন পরের জন্যে মাথাব্যথা হওয়াটা নিজেরই নিতান্ত ছেলেমানুষি বলে মনে হবে, তখন আমার এই কথাটি স্মরণ করবেন।

প্রত্যুত্তরে রমেশ শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল। খানিক পরে রমার মতই ধীরে ধীরে বলিল,—আমি তোমাকে স্মরণ করেই বলচি, আজ আমার এ কথা কোনমতেই মনে হচ্ছে না। আমি তোমার ত কেউ নই রমা, বরং তোমার পথের কাঁটা। তবু প্রতিবেশী বলে আজ তোমার কাছে যে যত্ন পেলুম, সংসারে ঢুকে এ যত্ন যারা আপনার লোকের কাছে নিত্য পায়, আমার ত মনে হয় পরের দুঃখ-কষ্ট দেখলে তারা পাগল হয়ে ছোটে। এইমাত্র আমি একা বসে চুপ করে ভাবছিলুম, আমার সমস্ত জীবনটি যেন তুমি এই একটা বেলার মধ্যে আগাগোড়া বদলে দিয়েচ। এমন করে আমাকে কেউ কখনো খেতে বলেনি, এত যত্ন করে আমাকে কেউ কোনদিন খাওয়ায় নি। খাওয়ার মধ্যে যে এত আনন্দ আছে, আজ তোমার কাছ থেকে এই প্রথম জানলাম রমা।

কথা শুনিয়া রমার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া বারংবার শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ স্থির হইয়া বলিল, এ ভুলতে আপনার বেশি দিন লাগবে না। যদি বা একদিন মনেও পড়ে, অতি তুচ্ছ বলেই মনে পড়বে।

রমেশ কোনও উত্তর করিল না।

রমা কহিল, দেশে গিয়ে যে নিন্দে করবেন না এই আমার ভাগ্য।

রমেশ আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, না রমা, নিন্দেও করব না, সুখ্যাতি করেও বেড়াব না। আজকের দিনটা আমার নিন্দা-সুখ্যাতির বাইয়ে।

রমা কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া খানিকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া নিজের ঘরে উঠিয়া চলিয়া গেল। সেখানে নির্জন ঘবের মধ্যে তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া বড় বড় অশ্রুব ফোঁটা টপ্‌টপ্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

॥ এগার ॥

দুইদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়া অপরাহ্নবেলায় একটু ধরন করিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপে গোপাল সরকারের কাছে বসিয়া রমেশ জমিদারির হিসাবপত্র দেখিতেছিল; অকস্মাৎ প্রায় কুড়িজন কৃষক আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল—ছোটবাবু, এ যাত্রা রক্ষে করুন, আপনি না বাঁচালে ছেলেপুলের হাত ধরে আমাদের পথে ভিক্ষে করতে হবে।

রমেশ অবাক হইয়া কহিল, ব্যাপার কি ?

চাষীরা কহিল, এক শ' বিঘের মাঠ ডুবে গেল, জল বার করে না দিলে সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যাবে বাবু, গাঁয়ে একটা ঘরও খেতে পাবে না।

কথাটা রমেশ বুঝিতে পারিল না। গোপাল সরকার তাহাদের দুই-একটা প্রশ্ন করিয়া ব্যাপারটা রমেশকে বুঝাইয়া দিল। এক শ' বিঘার মাঠটাই এ গ্রামের একমাত্র ভরসা। সমস্ত চাষীদেরই কিছু কিছু জমি তাহাতে আছে। ইহার পূর্বধারে সরকারী প্রকাণ্ড বাঁধ, পশ্চিম ও উত্তর ধারে উচ্চ গ্রাম, শুধু দক্ষিণ ধারের বাঁধটা ঘোষাল ও মুখুয্যেদের। এক দিক দিয়া জল-নিকাশ করা যায় বটে, কিন্তু বাঁধের গায়ে একটা জলার মত আছে। বৎসরে-দু-শ' টাকার মাছ বিক্রি হয় বলিয়া জমিদার বেণুবাবু তাহা কড়া পাহারায় আটকাইয়া রাখিয়াছেন। চাষীরা আজ সকাল হইতে তাঁহাদের কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়া এইমাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া এখানে আসিয়াছে।

রমেশ আর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল না, দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। এ বাড়িতে আসিয়া যখন প্রবেশ করিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বেণী তাকিয়া ঠেস দিয়া তামাক খাইতেছে এবং কাছে হালদার মহাশয় বসিয়া আছেন ; বোধ করি এই কথাই হইতেছিল। রমেশ কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই কহিল, জলার বাঁধ আটকে রাখলে ত আর চলবে না, এখনি সেটা কাটিয়ে দিতে হবে।

বেণী হুঁকাটা হালদারের হাতে দিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, কোন্ বাঁধটা ?

রমেশ উত্তেজিত হইয়াই আসিয়াছিল, ক্রুদ্ধভাবে কহিল, জলার বাঁধ আর ক'টা আছে বড়দা ? না কাটলে সমস্ত গাঁয়ের ধান হেজে যাবে। জল বার করে দেবার হুকুম দিন।

বেণী কহিল, সেই সঙ্গে দু-তিন শ' টাকার মাছ বেরিয়ে যাবে খবরটা রেখেচ কি ? এ টাকাটা দেবে কে ? চাষারা, না তুমি ?

রমেশ রাগ সামলাইয়া বলিল, চাষারা গরীব, তারা দিতে ত পারবেই না, আর আমিই বা কেন দেব সে ত বুঝতে পারিনে !

বেণী জবাব দিল, তা হলে আমরাই বা কেন এত লোকসান করতে যাব সে ত আমি বুঝতে পারিনে।

হালদারের দিকে চাহিয়া বলিল, খুড়ো, এমনি করে ভায়া আমার জমিদারি রাখবেন ! ওহে রমেশ, হারামজাদারা সকাল থেকে এতক্ষণ এইখানে পড়েই মড়াকান্না কাঁদছিল। আমি সব জানি। তোমার সদরে কি দরোয়ান নেই ? তার পায়ের নাগরাজুতো নেই। যাও, ঘরে গিয়ে সেই ব্যবস্থা কর গে ; জল আপনি নিকেশ হয়ে যাবে। বলিয়া বেণী হালদারের সঙ্গে একযোগে হিঃ হিঃ করিয়া নিজের রসিকতায় নিজে হাসিতে লাগিল।

রমেশের আর সহ্য হইতেছিল না, তথাপি সে প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করিয়া

বিনীতভাবে বলিল, ভেবে দেখুন বড়দা, আমাদের তিন ঘরের দু-শ' টাকার লোকসান বাঁচাতে গিয়ে গরীবদের সারা বছরের অন্ন মারা যাবে। যেমন করে হোক, পাঁচ-সাত হাজার টাকা তাদের ক্ষতি হবেই।

বেণী হাতটা উলটাইয়া বলিল, হ'ল হ'লই। তাদের পাঁচ হাজারই যাক, আর পঞ্চাশ হাজারই যাক, আমার গোটা সদরটা কোপালেও ত দুটো পয়সা বার হবে না যে ও-শালাদের জন্যে দু-দু-শ' টাকা উড়িয়ে দিতে হবে?

রমেশ শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, এরা সারা বছর খাবে কি?

যেন ভারি হাসির কথা! বেণী একবার এপাশ একবার ওপাশ হেলিয়া দুলিয়া, মাথা নাড়িয়া, হাসিয়া, থুথু ফেলিয়া, শেষে স্থির হইয়া কহিল, খাবে কি? দেখবে ব্যাটারা যে যার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছেই টাকা ধার করতে ছুটে আসবে। ভায়া, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করে চল, কর্তারা এমনি করেই বাড়িয়ে গুছিয়ে এই যে এক-আধটুকরা উচ্ছিষ্ট ফেলে রেখে গেছেন, এই আমাদের নেড়ে-চেড়ে গুছিয়ে গাছিয়ে খেয়েদেয়ে আবার ছেলেদের জন্যে রেখে যেতে হবে। ওরা খাবে কি? ধার-কর্জ করে খাবে। নইলে আর ব্যাটাদের ছোটলোক বলেচে কেন?

ঘৃণায় লজ্জায়, ক্রোধে, ক্ষোভে রমেশের চোখ-মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কণ্ঠস্বর শান্ত রাখিয়াই বলিল,—আপনি যখন কিছুই করবেন না বলে স্থির করেছেন, তখন এখানে দাঁড়িয়ে তর্ক করে লাভ নেই। আমি রমার কাছে চললুম, তার মত হ'লে আপনার একার অমতে কিছু হবে না।

বেণীর মুখ গম্ভীর হইল; বলিল, বেশ, গিয়ে দেখ গে তার আমার মত ভিন্ন নয়। সে সোজা মেয়ে নয় ভায়া, তাকে ভোলানো সহজ নয়। আর তুমি ত ছেলেমানুষ, তোমার বাপকেও সে চোখের জলে নাকের জলে করে তবে ছেড়েছিল। কি বল খুড়ো?

খুড়োর মতামতের জন্য রমেশের কৌতূহল ছিল না। বেণীর এই অত্যন্ত অপমানকর প্রশ্নের উত্তর দিবারও তাহার প্রবৃত্তি হইল না; নিরুত্তরে বাহির হইয়া গেল।

প্রাঙ্গণে তুলসীমূলে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিয়া প্রণাম সাঙ্গ করিয়া রমা মুখ তুলিয়াই বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। ঠিক সুমুখে রমেশ দাঁড়াইয়া। তাহার মাথার আঁচল গলায় জড়ানো। ঠিক যেন সে এইমাত্র রমেশকেই নমস্কার করিয়া মুখ তুলিল। ক্রোধের উত্তেজনায় ও উৎকণ্ঠায় মাসির সেই প্রথম দিনের নিষেধবাক্য রমেশের স্মরণ ছিল না; তাই সে সোজা ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং রমাকে তদবস্থার দেখিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছিল। দু'জনের মাস-খানেক পরে দেখা।

রমেশ কহিল, তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত শুনেছ। জল বার করে দেবার জন্যে তোমার মত নিতে এসেছি।

রমার বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া গেল ; সে মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়া কহিল, সে কেমন করে হবে ? তা ছাড়া বড়দার মত নেই।

নেই জানি ! তাঁর একলার অমতে কিছুই আসে যায় না।

রমা একটুখানি ভাবিয়া কহিল, জল বার করে দেওয়াই উচিত বটে, কিন্তু মাছ আটকে রাখার কি বন্দোবস্ত করবেন ?

রমেশ কহিল, অত জলে কোন বন্দোবস্ত হওয়া সম্ভব নয়। এ বছর সে টাকাটা আমাদের ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে। না হলে গ্রাম মারা যায়।

রমা চুপ করিয়া রহিল।

রমেশ কহিল, তা হলে অনুমতি দিলে ?

রমা মৃদুকণ্ঠে বলিল, না, অত টাকা লোকসান আমি করতে পারব না।

রমেশ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে কিছুতেই এরূপ উত্তর আশা করে নাই। বরং কেমন করিয়া তাহার যেন নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহার একান্ত অনুরোধ রমা কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না।

রমা মুখ তুলিয়াই বোধ করি রমেশের অবস্থাটা অনুভব করিল। কহিল, তা ছাড়া, বিষয় আমার ভাইয়ের, আমি অভিভাবক মাত্র।

রমেশ কহিল, না অর্ধেক তোমার।

রমা বলিল, শুধু নামে। বাবা নিশ্চয় জানতেন সমস্ত বিষয় যতীনই পাবে ; তাই অর্ধেক আমার নামে দিয়ে গেছেন।

তথাপি রমেশ মিনতির কণ্ঠে কহিল, রমা, এ ক'টা টাকা ? তোমার অবস্থা এ দিকের মধ্যে সকলের চেয়ে ভাল। তোমার কাছে এ ক্ষতি ক্ষতিই নয়, আমি মিনতি করে জানাচ্ছি রমা, এর জন্যে এত লোকের অন্নকষ্ট করে দিও না। যথার্থ বলচি, তুমি যে এত নিষ্ঠুর হতে পার, আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

রমা তেমনি মৃদুভাবেই জবাব দিল, নিজের ক্ষতি করতে পারিনি বলে যদি নিষ্ঠুর হই, নাহয় তাই। ভাল, আপনার যদি এতই দয়া, নিজেই নাহয় ক্ষতিপূরণ করে দিন না।

তাহার মৃদুস্বরে বিদ্রূপ কল্পনা করিয়া রমেশ জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, রমা, মানুষ খাঁটি কি না, চেনা যায় শুধু টাকার সম্পর্কে ! এই জায়গায় নাকি ফাঁকি চলে না, তাই এইখানেই মানুষের যথার্থ রূপ প্রকাশ পেয়ে উঠে। তোমরাও আজ তাই পেল। কিন্তু তোমাকে আমি এমন করে ভাবিনি। চিরকাল ভেবেচি তুমি এর চেয়ে অনেক উঁচুতে ; কিন্তু তুমি তা নও। তোমাকে নিষ্ঠুর বলাও ভুল। তুমি নীচ, অতি ছোটো।

অসহ্য বিস্ময়ে রমা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, কি আমি ?

রমেশ কহিল, তুমি অত্যন্ত হীন এবং নীচ। আমি যে কত ব্যাকুল হয়ে উঠেছি সে তুমি টের পেয়েছ বলেই আমার কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি করলে। কিন্তু বড়দাও মুখ ফুটে এ কথা বলতে পারেন নি ; পুরুষমানুষ হয়ে তাঁর মুখে যা বেধেচে, স্ত্রীলোক হয়ে তোমার মুখে তা বাধেনি। আমি এর চেয়েও বেশি ক্ষতিপূরণ করতে পারি—কিন্তু একটা কথা আজ তোমাকে বলে দিচ্ছি রমা, সংসারে যত পাপ আছে, মানুষের দয়ার উপর জুলুম করাটা সবচেয়ে বেশি। আজ তুমি তাই করে আমার কাছে টাকা আদায়ের চেষ্টা করেচ।

রমা বিহ্বল হতবুদ্ধির ন্যায় ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল, একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। রমেশ তেমনি শান্ত তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, আমার দুর্বলতা কোথায় সে তোমার অগোচর নেই বটে, কিন্তু সেখানে পাক দিয়ে আর এক বিন্দু রস পাবে না, তা বলে দিয়ে যাচ্ছি। আমি কি করব, তাও এই সঙ্গে জানিয়ে দিয়ে যাই। এখনই জোর করে বাঁধ কাটিয়ে দেব—তোমার পার আটকাবার চেষ্টা কর গে। বলিয়া রমেশ চলিয়া যায় দেখিয়া রমা ফিরিয়া ডাকিল। আহ্বান শুনিয়া রমেশ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে রমা কহিল, আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে যত অপমান করলেন, আমি তার একটারও জবাব দিতে চাইনে, কিন্তু এ কাজ আপনি কিছুতেই করবেন না।

রমেশ প্রশ্ন করিল, কেন ?

রমা কহিল, কারণ, এত অপমানের পরেও আমার আপনার সঙ্গে বিবাদ করতে ইচ্ছে করে না।

তাহার মুখ যে কিরূপ অস্বাভাবিক পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল এবং কথা কহিতে ঠোঁট কাঁপিয়া গেল, তাহা সন্ধ্যার অন্ধকারেও রমেশ লক্ষ্য করিতে পারিল। কিন্তু মনস্তত্ত্ব আলোচনার অবকাশ এবং প্রবৃত্তি তাহার ছিল না ; তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, কলহ-বিবাদের অভিরুচি আমারও নেই, একটু ভাবলেই তা টের পাবে। কিন্তু তোমার সদ্ভাবের মূল্যও আর আমার কাছে কিছুমাত্র নেই। যাই হোক, বাগ্‌বিতণ্ডার আবশ্যক নেই, আমি চললুম।

মাসি উপরে ঠাকুরঘরে আবদ্ধ থাকায় এ-সকলের কিছুই জানিতে পারেন নাই। নীচে আসিয়া দেখিলেন, রমা দাসীকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইতেছে। আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, এই জলকাদায় সন্ধ্যার পর কোথায় যাস, রমা ?

একবার বড়দার ওখানে যাব মাসি।

দাসী কহিল, পথে আর এতটুকু কাদা পাবার জো নেই দিদিমা। ছোটবাবু এমনি রাস্তা বাঁধিয়ে দিয়েচেন যে, সিঁদুর পড়লে কুড়িয়ে নেওয়া যায়। ভগবান তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন, গরীব-দুঃখী সাপের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বেঁচেচে।

তখন রাত্রি বোধ করি এগারোটা। বেণীর চণ্ডীমণ্ডপ হইতে অনেকগুলি

লোকের চাপা গলার আওয়াজ আসিতেছিল। আকাশে মেঘ কতকটা কাটিয়া গিয়া ত্রয়োদশীর অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে খুঁটিতে ঠেস দিয়া একজন ভীষণাকৃতি প্রৌঢ় মুসলমান চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিল। তাহার সমস্ত মুখের উপর কাঁচা রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে—পরনের বস্ত্র রক্তে রাঙ্গা, কিন্তু সে চুপ করিয়া আছে। বেণী চাপা গলায় অনুনয় করিতেছেন, কথা শোন আকবর, থানায় চল। সাত বছর যদি না তাকে দিতে পারি ত ঘোষাল-বংশের ছেলে নই আমি। পিছনে চাহিয়া কহিল, রমা তুমি একবার বল না, চুপ করে রইলে কেন?

কিন্তু রমা তেমনি কাঠের মত নীরবে বসিয়া রহিল।

আকবর আলি এবার চোখ খুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, সাবাস! হাঁ—মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে ছোটবাবু! লাঠি ধরলে বটে!

বেণী ব্যস্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, সেই কথা বলতেই ত বলচি আকবর! কার লাঠিতে তুই জখম হলি? সেই ছোঁড়ার, না তার হিন্দুস্থানী চাকরটার?

আকবরের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি প্রকাশ পাইল। কহিল, সেই বেঁটে হিন্দুস্থানীটার? সে ব্যাটা লাঠির জানে কি বড়বাবু? কি বলিস রে গহর, তোর পয়লা চোটেই, সে বসেছিল না রে!

আকবরের দুই ছেলেই অদূরে জড়সড় হইয়া বসিয়া ছিল। তাহারাও অনাহত ছিল না। গহর মাথা নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না। আকবর কহিতে লাগিল, আমার হাতের চোট পেলে সে ব্যাটা বাঁচত না। গহরের লাঠিতেই 'বাপ' বসে পড়ল, বড়বাবু!

রমা উঠিয়া আসিয়া অনতিদূরে দাঁড়াইল। আকবর তাহাদের পিরপুরের প্রজা; সাবেক দিনের লাঠির জোরে অনেক বিষয় হস্তগত করিয়া দিয়াছে। তাই আজ সন্ধ্যার পর ক্রোধে ও অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রমা তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বাঁধ পাহারা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং ভাল করিয়া একবার দেখিতে চাহিয়াছিল, রমেশ শুধু সেই হিন্দুস্থানীটার গায়ের জোরে কেমন করিয়া কি করে। সে নিজেই যে এতবড় লাঠিয়াল, এ কথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।

আকবর রমার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, ছোটবাবু সেই ব্যাটার লাঠি তুলে নিয়ে বাঁধ আটক করে দাঁড়াল দিদিঠাকরান, তিন বাপ-বেটায় মোরা হটাতে নারলাম। আঁধারে বাঘের মত তেনার চোখ জ্বলতি লাগল। কইলেন, আকবর, বুড়োমানুষ তুই, সরে যা। বাঁধ কেটে না দিলে সারা গাঁয়ের লোক মারা পড়বে, তাই কেটতেই হবে। তোর আপনার গাঁয়েও ত জমিজমা আছে, সমুঝে দেখ রে, সব বরবাদ হয়ে গেলে তোর ক্যামন লাগে?

মুই সেলাম করে কইলাম, আল্লার কিরে ছোটবাবু, তুমি একটিবার পথ ছাড়।

তোমরে আড়ালে দাঁড়িয়ে ঐ যে ক' সম্মুন্দি মুয়ে কাপড় জড়ায়ে ঝপাঝপ কোদাল মারচে, ওদের মুন্ডু ক'টা ফাঁক করে দিয়ে যাই।

বেণী রাগ সামলাইতে না পারিয়া কথার মাঝখানেই চেঁচাইয়া কহিল, বেইমান ব্যাটারা—তাকে সেলাম বাজিয়ে এসে এখানে চালাকি মারা হচ্চে—

তাহারা তিন বাপ-বেটাই একেবারে একসঙ্গে হাত তুলিয়া উঠিল। আকবর কর্কশকণ্ঠে কহিল, খবরদার বড়বাবু, বেইমান কয়ো না। মোরা মোছলমানের ছ্যালে, সব সইতে পারি—ও পারি না।

কপালে হাত দিয়া খানিকটা রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া রমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কারে বেইমান কয় দিদি? ঘরের মধ্যি বসে বেইমান কইচ বড়বাবু, চোখে দেখলি জানতি পারতে ছোটবাবু কি!

বেণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, ছোটবাবু কি! তাই থানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না! বলবি, তুই বাঁধ পাহারা দিচ্ছিলি, ছোটবাবু চড়াও হয়ে তোকে মেরেচে!

আকবর জিভ কাটিয়া বলিল, তোবা, তোবা দিনকে রাত করতি বল বড়বাবু?

বেণী কহিল, নাহয় আর কিছু বলবি। আজ গিয়ে জখম দেখিয়ে আয় না কাল ওয়ারেণ্ট বার করে একেবারে হাজতে পুরব। রমা, তুমি ভাল করে আর একবার বুঝিয়ে বল না। এমন সুবিধে যে আর কখনো পাওয়া যাবে না।

রমা কথা কহিল না, শুধু আকবরের মুখের প্রতি একবার চাহিল। আকবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, দিদিঠাকরান, ও পারবনা।

বেণী ধমক দিয়া কহিল, পারবি নে কেন?

এবার আকবরও চেঁচাইয়া কহিল, কি কও বড়বাবু, সরম নেই মোর? পাঁচখানা গাঁয়ের লোকে মোরে সদ্দার কয় না? দিদিঠাকরান, তুমি হুকুম করলে আসামী হয়ে জ্যাল খাটতে পারি, ফৈরিদি হব কোন্ কালামুখে?

রমা মৃদুকণ্ঠে একবারমাত্র কহিল, পারবে না আকবর?

আকবর সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, না দিদিঠাকরান, আর সব পারি, সদরে গিয়ে গায়ের চোট দেখাতে পারি না। ওঠ রে গহর, এইবার ঘরকে যাই। মোরা নালিশ করতি পারব না। বলিয়া তাহারা উঠিবার উপক্রম করিল।

বেণী ক্রুদ্ধ নিরাশায় তাহাদের দিকে চাহিয়া দুই চোখে অগ্নিবর্ষণ করিয়া মনে মনে অকথ্য গালিগালাজ করিতে লাগিল এবং রমার একান্ত নিরুদ্যম স্তব্ধতার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তুষের আগুনে পুড়িতে লাগিল। সর্বপ্রকার অনুনয়, বিনয়, ভর্ৎসনা, ক্রোধ উপেক্ষা করিয়া আকবর আলি ছেলেদের লইয়া গেল, রমার বুক চিরিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া, অকারণে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল এবং আজিকার এত বড় অপমান ও তাহার সম্পূর্ণ পরাজয়েও কেন যে কেবলি মনে হইতে লাগিল, তাহার বুকের উপর

হইতে একটা অতি গুরুভার পাষাণ নামিয়া গেল ; ইহার কোন হেতুই সে খুঁজিয়া পাইল না। বাড়ি ফিরিয়া সারারাত্রি তাহার ঘুম হইল না, সেই যে তারকেশ্বরে সমুখে বসিয়া খাওয়াইয়াছিল, নিরন্তর তাহাই চোখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। এবং যতই মনে হইতে লাগিল, সেই সুন্দর সুকুমার দেহের মধ্যে এত মায়া এবং এত তেজ কি করিয়া এমন স্বচ্ছন্দে শান্ত হইয়া ছিল, ততই তাহার চোখের জলে সমস্ত মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বার ॥

ছেলেবেলায় একদিন রমেশ রমাকে ভালবাসিয়াছিল। নিতান্ত ছেলেমানুষী ভালবাসা তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু সে যে কত গভীর সেদিন তারকেশ্বরে ইহা সে প্রথম অনুভব করিয়াছিল এবং সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়াছিল যেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে রমার সমস্ত সম্বন্ধ সে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। তার পরে সেই নিদারুণ রাত্রির ঘটনার দিন হইতে রমার দিকটাই একেবারে রমেশের কাছে মহামরুর ন্যায় শূন্য ধূ-ধূ করিতেছিল। কিন্তু সে যে তাহার সমস্ত কাজ-কর্ম, শোয়া-বসা এমন কি, চিন্তা-অধ্যয়ন পর্যন্ত এমন বিস্বাদ করিয়া দিবে, তাহা রমেশ কল্পনাও করে নাই। তাহাতে গৃহ-বিচ্ছেদ এবং সর্বব্যাপী অনাত্মীযতায় প্রাণ যখন তাহার একমুহূর্ত আর গ্রামের মধ্যে তিষ্ঠিতে চাহিতেছিল না, তখন নিম্নলিখিত ঘটনায় সে আর একবার সোজা হইয়া বসিল।

খালের ওপারে পিরপুর গ্রাম তাহাদেরই জমিদারি। এখানে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। একদিন তাহারা দল বাঁধিয়া রমেশের কাছে উপস্থিত হইল ; এই বলিয়া নালিশ জানাইল যে, যদিচ তাহারা তাঁহাদেরই প্রজা, তথাচ তাহাদের ছেলেপিলেকে মুসলমান বলিয়া গ্রামের স্কুলে ভর্তি হইতে দেওয়া হয় না। কয়েকবার চেষ্টা করিয়া তাহারা বিফলমনোরথ হইয়াছে, মাস্টারমহাশয়রা কোন-মতেই তাহাদের ছেলেদের গ্রহণ করেন না। রমেশ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, এমন অন্যায় অত্যাচার ত কখনও শুনিনি ! তোমাদের ছেলেদের আজই নিয়ে এস, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভর্তি ক'রে দেব।

তাহারা জানাইল, যদিচ তাহারা প্রজা বটে, কিন্তু খাজনা দিয়াই জমি ভোগ করে। সেজন্য হিন্দুর মত জমিদারকে তাহারা ভয় করে না ; কিন্তু এক্ষেত্রে বিবাদ করিয়াও লাভ নাই। কারণ, ইহাতে বিবাদই হইবে, যথার্থ উপকার কিছুই হইবে না। বরঞ্চ তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা ছোট রকমের স্কুল করিতে ইচ্ছা করে এবং ছোটবাবু একটু সাহায্য করিলেই হয়। কলহ-বিবাদে

রমেশ নিজেও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং ইহাকে আর বাড়াইয়া না তুলিয়া ইহাদের পরামর্শ সুযুক্তি বিবেচনা করিয়া সায় দিল এবং তখন হইতে এই নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেই ব্যাপৃত হইল। ইহাদের সম্পর্কে আসিয়া রমেশ শুধু যে নিজেকে সুস্থ বোধ করিল তাহা নহে, এই একটা বৎসর ধরিয়া তাহার যত বলক্ষয় হইয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে যেন ভরিয়া আসিতে লাগিল। রমেশ দেখিল, কুঁয়াপুরের হিন্দু-প্রতিবেশীর মত ইহারা প্রতি কথায় বিবাদ করে না; করিলেও তাহারা প্রতিহাত এক নম্বর রুজু করিয়া দিবার জন্য সদরে ছুটিয়া যায় না। বরঞ্চ মুরুব্বিদের বিচারফলই, সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট যেভাবেই হোক, গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ বিপদের দিনে পরস্পরের সাহায্যার্থে এরূপ সর্বান্তঃকরণে অগ্রসর হইয়া আসিতে রমেশ ভদ্র-অভদ্র কোন হিন্দু গ্রাম-বাসীকেই দেখে নাই।

একে ত জাতিভেদের উপর রমেশের কোন দিনই আস্থা ছিল না, তাহাতে এই দুই গ্রামের অবস্থা পাশাপাশি তুলনা করিয়া তাহার অশ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়া গেল। সে স্থির করিল, হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম ও সামাজিক অসমতাই এই হিংসা-দ্বেষের কারণ। অথচ মুসলমানমাত্রই ধর্ম সম্বন্ধে পরস্পর সমান, তাই একতার বন্ধন ইহাদের মত হিন্দুদের নাই এবং হইতেও পারে না। আর জাতিভেদ নিবারণ করিবার কোন উপায় যখন নাই, এমন কি, ইহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করাও যখন পল্লীগ্রামে একরূপ অসম্ভব, তখন কলহ-বিবাদের লাঘব করিয়া সখ্য ও প্রীতি-সংস্থাপনে প্রযত্ন করাও পণ্ডশ্রম। সুতরাং এই কয়টা বৎসর ধরিয়া সে নিজের গ্রামের জন্য যে বৃথা চেষ্টা করিয়া মরিয়াছিল, সেজন্য তাহার অত্যন্ত অনুশোচনা বোধ হইতে লাগিল। তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিল, ইহারা এমনি খাওয়াখায়ি করিয়াই চিরদিন কাটাইয়াছে এবং এমনি করিয়াই চিরদিন কাটাইতে বাধ্য। ইহাদের ভাল কোনদিন কোনমতেই হইতে পারে না। কিন্তু কথাটা পাকা করিয়া লওয়া ত চাই!

নানা কারণে অনেকদিন হইতে তাহার জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। সেই মারামারির পর হইতে কতকটা ইচ্ছা করিয়াই সে সেদিকে যায় নাই। আজ ভোরে উঠিয়া সে একেবারে তাঁর ঘরের দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যাঠাইমার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার উপর তাহার এমন বিশ্বাস ছিল যে, সে কথা তিনি নিজেও জানিতেন না। রমেশ একটুখানি আশ্চর্য হইয়াই দেখিল, জ্যাঠাইমা এত প্রত্যুষেই স্নান করিয়া প্রস্তুত হইয়া সেই অস্পষ্ট আলোকে ঘরের মেঝেয় বসিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া একখানি বই পড়িতেছেন। তিনিও বিস্মিত কম হইলেন না। বইখানি বন্ধ করিয়া তাহাকে আদর করিয়া ঘরে ডাকিয়া বসাইলেন এবং মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এত সকালেই যে রে?

রমেশ কহিল, অনেক দিন তোমাকে দেখতে পাইনি জ্যাঠাইমা। আমি পিরপুরে একটা স্কুল করচি।

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, শুনেচি। কিন্তু আমাদের স্কুলে আর পড়াতে যাস্‌নে কেন বল্‌ ত?

রমেশ কহিল, সেই কথাই বলতে এসেচি জ্যাঠাইমা। এদের মঙ্গলের চেষ্টা করা শুধু পণ্ডশ্রম। যারা কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না, অভিমান অহঙ্কার যাদের এত বেশি, তাদের মধ্যে খেটে মরায় লাভ কিছুই নেই, শুধু মাঝ থেকে নিজেরই শত্রু বেড়ে ওঠে। বরং যাদের মঙ্গলের চেষ্টায় সত্যিকার মঙ্গল হবে, আমি সেইখানেই পরিশ্রম করব।

জ্যাঠাইমা কহিলেন, এ কথা ত নতুন নয় রমেশ! পৃথিবীতে ভাল করবার ভার যে কেউ নিজের ওপর নিয়েছে চিরদিনই তার শত্রু-সংখ্যা বেড়ে উঠেছে। সেই ভয়ে যারা পেছিয়ে দাঁড়ায় তুইও তাদের দলে গিয়ে যদি মিশিস্‌, তা হলে ত চলবে না বাবা! এ গুরুভার ভগবান তোকেই বইতে দিয়েছেন, তোকেই বয়ে বেড়াতে হবে! কিন্তু হাঁ রে রমেশ, তুই নাকি ওদের হাতে জল খাস?

রমেশ হাসিয়া কহিল, ঐ দ্যাখ জ্যাঠাইমা, এর মধ্যেই তোমার কানে উঠেচে। এখনো খাইনি বটে, কিন্তু খেতে ত আমি কোন দোষ দেখিনি। আমি তোমাদের জাতিভেদ মানিনে।

জ্যাঠাইমা আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, মানিস নে কি রে? এ কি মিছে কথা, না জাতিভেদ নেই যে তুই মানবি নে?

রমেশ কহিল, ঠিক ওই কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে আজ তোমার কাছে এসেছিলাম জ্যাঠাইমা। জাতিভেদ আছে তা মানি, কিন্তু একে ভাল বলে মানিনে।

কেন?

রমেশ হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া কহিল, কেন সে তোমাকে বলতে হবে? এর থেকেই যত মনোমালিন্য, যত বাদাবাদি, এ কি তোমার জানা নেই? সমাজে যাকে ছোটজাত করে রাখা হয়েচে, সে যে বড়কে হিংসা করবে, এই ছোট হয়ে থাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, এর থেকে মুক্ত হতে চাইবে—সে ত খুব স্বাভাবিক। হিন্দুরা সংগ্রহ করতে চায় না, জানে না—জানে শুধু অপচয় করতে। নিজেকে এবং নিজের জাতকে রক্ষা করবার এবং বাড়িয়ে তোলবার যে একটা সাংসারিক নিয়ম আছে, আমরা তাকেই স্বীকার করি না বলেই প্রতিদিন ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছি। এই যে মানুষ গণনা করার একটা নিয়ম আছে, তার ফলাফলটা যদি পড়ে দেখতে জ্যাঠাইমা, তা হলে ভয় পেয়ে যেতে। মানুষকে ছোট করে অপমান করবার ফল হাতে হাতে টের পেতে! দেখতে পেতে কেমন করে হিন্দুরা প্রতিদিন কমে আসচে এবং মুসলমানেরা সংখ্যায় বেড়ে উঠেচে। তবু ত হিন্দুর হুঁশ হয় না!

বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, তোর এত কথা শুনে এখনো ত আমার হুঁশ হচ্ছে না রমেশ! যারা তোদের মানুষ গুণে বেড়ায়, তারা যদি গুণে বলতে পারে, এতগুলো ছোটজাত শুধুমাত্র ছোট থাকবার ভয়েই জাত দিয়েচে, তা হলে হয়ত আমার হুঁশ হতেও পারে। হিন্দু যে কমে আসচে সে কথা মানি; কিন্তু তার অন্য কারণ আছে। সেটাও সমাজের ত্রুটি নিশ্চয়; কিন্তু ছোটজাতের জাত দেওয়া-দেওয়ি তার কারণ নয়। শুধু ছোট বলে কোন হিন্দুই কোনদিন জাত দেয় না।

রমেশ সন্দিগ্ধকণ্ঠে কহিল, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাই ত অনুমান করেন জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা বলিলেন, অনুমানের বিরুদ্ধে ত তর্ক চলে না বাবা। কেউ যদি এমন খবর দিতে পারে, অমুক গাঁয়ের এতগুলো ছোটজাত এই জন্যেই এ বৎসর জাত দিয়েচে, তা হলেও না হয় পণ্ডিতের কথায় কান দিতে পারি। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, এ সংবাদ কেউ দিতে পারবে না।

রমেশ তথাপি তর্ক করিয়া কহিল, কিন্তু যারা ছোটজাত তারা যে অন্যান্য বড় জাতকে হিংসা করে চলবে, এ ত আমার কাছে ঠিক কথা বলেই মনে হয় জ্যাঠাইমা!

রমেশের তীব্র উত্তেজনায় বিশ্বেশ্বরী আবার হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ঠিক কথা নয় বাবা, একটুকুও ঠিক কথা নয়। এ তোদের শহর নয়। পাড়াগাঁয়ে জাত ছোট কি বড়, সেজন্যে কারো এতটুকুও মাথাব্যথা নেই। ছোটভাই যেমন ছোট বলে বড়ভাইকে হিংসা করে না, দু-এক বছর পরে জন্মাবার জন্যে যেমন তার মনে এতটুকু ক্ষোভ নেই, পাড়াগাঁয়েও ঠিক তেমনি। এখানে কায়েত বামুন হয়নি বলে একটুও দুঃখ করে না, কৈবর্তও কায়েতের সমান হবার জন্য একটুও চেষ্টা করে না। বড়ভাইকে একটা প্রণাম করতে ছোটভাইয়ের যেমন লজ্জায় মাথা কাটা যায় না, তেমন কায়েতেও বামুনের একটুখানি পায়ের ধুলো নিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। সে নয় বাবা, জাতিভেদ-টেদ হিংসে-বিদ্বেষের হেতুই নয়। অন্ততঃ বাঙ্গালীর যা মেরুদণ্ড—সেই পল্লীগ্রামে নয়।

রমেশ মনে মনে আশ্চর্য হইয়া কহিল, তবে কেন এমন হয় জ্যাঠাইমা? ও-গাঁয়ে ত এত ঘর মুসলমান আছে, তাদের মধ্যে ত এমন বিবাদ নেই। একজন আর একজনকে বিপদের দিনে এমন করে ত চেপে ধরে না। সেদিন অর্থাভাবে দ্বারিক ঠাকুরের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি বলে কেউ তার মৃতদেহটাকে ছুঁতে পর্যন্ত যায়নি, সে ত তুমি জান।

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, জানি বাবা, সব জানি। কিন্তু জাতিভেদ তার কারণ নয়। কারণ এই যে, মুসলমানদের মধ্যে এখনো সত্যকার একটা ধর্ম আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে তা নেই। যাকে যথার্থ ধর্ম বলে, পল্লীগ্রাম থেকে সে একেবারে

লোপ পেয়েচে। আছে শুধু কতকগুলো আচার-বিচারের কুসংস্কার, আর তার থেকে নিরর্থক দলাদলি।

রমেশ হতাশভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, এর কি প্রতিকারের কোন উপায় নেই জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, আছে বৈ কি বাবা! প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞানে। যে পথে তুই পা দিয়েচিস শুধু সেই পথে। তাই ত তোকে কেবলি বলি, তুই তোর এই জন্মভূমিকে কিছুতে ছেড়ে যাসনে।

প্রত্যুত্তরে রমেশ কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, বিশ্বেশ্বরী বাধা দিয়া বলিলেন, তুই বলবি মুসলমানদের মধ্যেও ত অজ্ঞান অত্যন্ত বেশি। কিন্তু তাদের সজীব ধর্মই তাদের সব দিকে শুধরে রেখেচে। একটা কথা বলি রমেশ, পিরপুরে খবর নিলে শুনতে পাবি, জাফর বলে একটা বড়লোককে তারা সবাই একঘরে করে রেখেছে। সে তার বিধবা সৎমাকে খেতে দেয় না বলে। কিন্তু আমাদের এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী সেদিন তার বিধবা বড়ভাজকে নিজের হাতে মেরে আধমরা করে দিলে, কিন্তু সমাজ থেকে তার শাস্তি হওয়া চুলোয় যাক, সে নিজেই একটা সমাজের মাথা হয়ে বসে আছে। এ-সব অপরাধ আমাদের মধ্যে শুধু ব্যক্তিগত পাপ-পুণ্য; এর সাজা ভগবান ইচ্ছা হয় দেবেন, না হয় না দেবেন, কিন্তু পল্লী-সমাজ তাতে ভ্রূক্ষেপ করে না।

এই নূতন তথ্য শুনিয়া একদিকে রমেশ যেমন অবাক হইয়া গেল, অন্যদিকে তাহার মন ইহাকেই স্থির-সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিতে লাগিল। বিশ্বেশ্বরী তাহা যেন বুঝিয়াই বলিলেন, ফলটাকেও উপায় বলে ভুল করিস নে বাবা! যেজন্যে তোর মন থেকে সংশয় ঘুচতে চাইচে না, সেই জাতের ছোট-বড় নিয়ে মারামারি করাটা উন্নতির একটা লক্ষণ, কারণ নয় রমেশ। সেটা সকলের আগে না হলেই নয়, মনে করে যদি তাকে নিয়েই নাড়াচাড়া করতে যাস, এদিক-ওদিক দুদিক নষ্ট হয়ে যাবে। কথাটা সত্যি কিনা যদি যাচাই করতে চাস রমেশ, শহরের কাছাকাছি দু-চারখানা গ্রাম ঘুরে এসে তাদের সঙ্গে তোর এই কুঁয়াপুরকে মিলিয়ে দেখিস আপনি টের পাবি।

কলিকাতার অতি নিকটবর্তী দু-একখানা গ্রামের সহিত রমেশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাহারই মোটামুটি চেহারাটা সে মনে মনে দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেই অকস্মাৎ তাহার চোখের উপর হইতে যেন একটা কালো পর্দা উঠিয়া গেল এবং গভীর সম্ভ্রম ও বিস্ময়ে চুপ করিয়া সে বিশ্বেশ্বরীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তিনি কিন্তু সেদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া নিজের পূর্বানুবৃত্তিরূপে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, তাই ত তোকে বার বার বলি বাবা, তুই যেন তোর জন্মভূমিকে ত্যাগ করে যাসনে! তোর মত বাইরে থেকে যারা বড় হতে পেরেচে,

তারা যদি তোর মতই গ্রামে ফিরে আসত, সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে চলে না যেত, পল্লীগ্রামের এমন দুরবস্থা হতে পারত না। তারা কখনই গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে মাথায় তুলে নিয়ে তোকে দূরে সরিয়ে দিতে পারত না।

রমেশের রমার কথা মনে পড়িল। তাই আবার অভিমানের সুরে কহিল, দূরে সরে যেতে আমারও আর দুঃখ নেই জ্যাঠাইমা!

বিশ্বেশ্বরী এই সুরটা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু হেতু বুঝিলেন না। কহিলেন, না রমেশ, সে কিছুতেই হতে পারবে না! যদি এসেচিস, যদি কাজ শুরু করেচিস, মাঝপথে ছেড়ে দিলে তোর জন্মভূমি তোকে ক্ষমা করবে না।

কেন জ্যাঠাইমা, জন্মভূমি শুধু ত আমার একার নয়!

জ্যাঠাইমা উদ্দীপ্ত হইয়া বলিলেন, তোর একার বৈ কি বাবা, শুধু তোরই মা! দেখতে পাসনে, মা মুখ ফুটে সন্তানের কাছে কোনদিনই কিছু দাবি করেন নি। তাই এত লোক থাকতে কারো কানেই তাঁর কান্না গিয়ে পোঁছতে পারেনি, কিন্তু তুই আসবামাত্রই শুনতে পেয়েছিলি।

রমেশ আর তর্ক করিল না, কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভরে বিশ্বেশ্বরীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ভক্তি, করুণা ও কর্তব্যের একান্ত নিষ্ঠায় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া লইয়া রমেশ বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তখন সবেমাত্র সূর্যোদয় হইয়াছে। তাহার ঘরের পূর্বদিকে মুক্ত জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে স্তব্ধ হইয়া আকাশের পানে চাহিয়াছিল, সহসা শিশুকণ্ঠের আহ্বানে সে চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল রমার ছোটভাই যতীন দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া লজ্জায় আরক্তভাবে ডাকিতেছে, ছোড়দা!

রমেশ কাছে গিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাকে ডাকচ যতীন?

আপনাকে।

আমাকে? আমাকে ছোড়দা বলতে তোমাকে কে বলে দিলে?

দিদি।

দিদি? তিনি কি কিছু বলতে তোমাকে পাঠিয়েছেন?

যতীন মাথা নাড়িয়া কহিল, কিছু না। দিদি বললেন, আমাকে সঙ্গে করে তোর ছোড়দার বাড়িতে নিয়ে চল—ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন, বলিয়া সে দরজার দিকে চাহিল।

রমেশ বিস্মিত ও ব্যস্ত হইয়া আসিয়া দেখিল, রমা একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। সরিয়া আসিয়া সবিনয়ে কহিল, আজ আমার এ কি সৌভাগ্য!

কিন্তু আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে, নিজে কষ্ট করে এলে কেন? এস, ঘরে এস।

রমা একবার ইতস্ততঃ করিল, তারপর যতীনের হাত ধরিয়া রমেশের অনুসরণ করিয়া তাহার ঘরের চৌকাঠের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল। কহিল, আজ একটা জিনিস ভিক্ষে চাইতে আপনার বাড়িতে এসেচি বলুন, দেবেন? বলিয়া সে রমেশের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সেই চাহনিতে রমেশের পরিপূর্ণ হৃদয়ের সপ্তস্বরা অকস্মাৎ যেন উন্মাদ-শব্দে বাজিয়া উঠিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া ঝরিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পূর্বেই তাহার মনের মধ্যে যে-সকল সংকল্প আশা ও আকাঙ্ক্ষা অপরূপ দীপ্তিতে নাচিয়া ফিরিতেছিল সমস্তই একেবারে নিবিয়া অন্ধকার হইয়া গেল। তথাপি প্রশ্ন করিল, কি চাই বল?

তাহার অস্বাভাবিক শুষ্কতা রমার দৃষ্টি এড়াইল না। সে তেমনি মুখের প্রতি চোখ রাখিয়া কহিল, আগে কথা দিন।

রমেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, মাথা নাড়িয়া কহিল, তা পারিনে। তোমাকে কিছুমাত্র প্রশ্ন না করেই আমার কথা দেবার শক্তি তুমি নিজের হাতেই যে ভেঙ্গে দিয়েছ রমা!

রমা আশ্চর্য হইয়া কহিল, আমি!

রমেশ বলিল, তুমি ছাড়া এ শক্তি আর কারুর ছিল না। রমা, আজ তোমাকে একটা সত্যকথা বলব! ইচ্ছা হয় বিশ্বাস ক'রো, না হয় ক'রো না। কিন্তু জিনিসটা যদি না একেবারে মরে নিঃশেষ হয়ে যেত, হয়ত কোনদিনই এ কথা তোমাকে শোনাতে পারতাম না, বলিয়া একটুখানি চুপ করিয়া পুনরায় কহিল, আজ নাকি আর কোনপক্ষেরই লেশমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই, তাই আজ জানাচ্চি, তোমাকে অদেয় আমার সেদিন পর্যন্ত কিছুই ছিল না। কিন্তু কেন জান?

রমা মাথা নাড়িয়া জানাইল, না। কিন্তু সমস্ত অন্তঃকরণটা তাহার কেমন একটা লজ্জাকর আশংকায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

রমেশ কহিল, কিন্তু শুনে রাগ ক'রো না, কিছুমাত্র লজ্জাও পেয়ো না। মনে ক'রো, এ কোন পুরাকালের একটা গল্প শুনচ মাত্র।

রমা মনে মনে প্রাণপণে বাধা দিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু মাথা তাহার এমনি ঝুঁকিয়া পড়িল যে, কিছুতেই সোজা করিয়া তুলিতে পারিল না। রমেশ তেমনি শান্ত, মৃদু ও নির্লিপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তোমাকে ভালবাসতাম রমা। আজ আমার মনে হয়, তেমন ভালবাসা বোধ করি কেউ কখনো বাসেনি; ছেলেবেলায় মার মুখে শুনতাম আমাদের বিয়ে হবে। তারপর যেদিন সমস্ত আশা ভেঙ্গে গেল, সেদিন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম, আজও আমার তা মনে পড়ে।

কথাগুলো জ্বলন্ত সীসার মত রমার দুই কানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ

করিয়া ফেলিতে লাগিল এবং একান্ত অপরিচিত অনুভূতির অসহ্য তীব্র বেদনায় তাহার বুকের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কাটিয়া কুচি কুচি করিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু নিষেধ করিবার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া নিতান্ত নিরুপায় পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রমা রমেশের বিষাক্ত-মধুর কথাগুলো একটির পর একটি ক্রমান্বয়ে শুনিয়া যাইতে লাগিল।

রমেশ কহিতে লাগিল, তুমি ভাবচ তোমাকে এ-সব কাহিনী শোনানো অন্যায়। আমার মনেও সেই সন্দেহ ছিল বলেই সেদিন তারকেশ্বরে যখন একটি দিনের যত্নে আমার সমস্ত জীবনের ধারা বদলে দিয়ে গেলে, তখনো চুপ করে ছিলাম। কিন্তু সে চুপ করে থাকাটা আমার পক্ষে সহজ ছিল না।

রমা কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারিল না, কহিল, তবে আজকেই বা বাড়িতে পেয়ে আমাকে অপমান করচেন কেন?

রমেশ কহিল, অপমান! কিছু না। এর মধ্যে মান-অপমানের কোন কথাই নেই। এ যাদের কথা হচ্ছে, সে রমাও কোন দিন তুমি ছিলে না, সে রমেশও আমি আর নেই! যাই হোক, শোন। সেদিন আমার কেন জানিনে, অসংশয়ে বিশ্বাস হয়েছিল তুমি যা ইচ্ছে বল, যা খুশি কর, কিন্তু আমার অমঙ্গল তুমি কিছুতেই সইতে পারবে না। বোধ করি ভেবেছিলাম, সেই যে ছেলেবেলায় একদিন আমাকে ভালবাসতে আজও তা একেবারে ভুলতে পারনি। তাই ভেবে-ছিলাম, কোন কথা তোমাকে না জানিয়ে, তোমার ছায়ায় বসে আমার সমস্ত জীবনের কাজগুলো ধীরে ধীরে করে যাব। তার পরে সে রাত্রে আকবরের নিজের মুখে যখন শুনতে পেলাম তুমি নিজে—ও কি, বাইরে এত গোলমাল কিসের?

বাবু—

গোপাল সরকারের ত্রস্ত-ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে রমেশ ঘরের বাহিরে আসিতেই সে কহিল, বাবু, পুলিশের লোক ভজুয়াকে গ্রেপ্তার করেচে।

কেন?

গোপালের ভয়ে ঠোঁট কাঁপিতেছিল; কোনমতে কহিল, পরশু রাত্তিরে রাধানগরের ডাকাতিতে সে নাকি ছিল।

রমেশ ঘরের দিকে চাহিয়া কহিল, আর একমুহূর্ত থেক না রমা, খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাও; পুলিশ খানাতল্লাসি করতে ছাড়বে না।

রমা নীলবর্ণ-মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল বলিল, তোমার কোন ভয় নেই ত?

রমেশ কহিল, বলতে পারিনে। কতদূর কি দাঁড়িয়েচে সে ত এখনো জানিনে।

একবার রমার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, একবার তাহার মনে পড়িল, পুলিশে সেদিন তাহার নিজের অভিযোগ করা—তার পরই সে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমি যাব না।

রমেশ বিস্ময়ে মুহূর্তকাল অবাক থাকিয়া বলিল, ছি,—এখানে থাকতে নেই রমা, শীগ্‌গির বেরিয়ে যাও, বলিয়া আর কোন কথা না শুনিয়া যতীনের হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া এই দুটি ভাই-বোনকে খিড়কির পথে বাহিরে করিয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

॥ তের ॥

আজ দুই মাস হইতে চলিল, কয়েকজন ডাকাতির আসামীর সঙ্গে ভজুয়া হাজতে। সেদিন থানাতল্লাশিতে রমেশের বাড়িতে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই এবং ভৈরব আচার্য সাক্ষ্য দিয়াছিল, সে রাত্রে ভজুয়া তাহার সঙ্গে তাহার মেয়ের পাত্র দেখিতে গিয়াছিল, তথাপি তাহাকে জামিনে খালাস দেওয়া হয় নাই।

বেণী আসিয়া কহিল, রমা, অনেক চাল ভেবে তবে কাজ করতে হয় দিদি, নইলে কি শত্রুকে সহজে জব্দ করা যায়! সেদিন মনিবের হুকুমে যে ভজুয়া লাঠি হাতে করে বাড়ি চড়াও হয়ে মাছ আদায় করতে এসেছিল, সে কথা যদি না তুমি থানায় লিখিয়ে রাখতে, আজ কি তা হলে ঐ ব্যাটাকে এমন কায়দায় পাওয়া যেত? অমনি ঐ সঙ্গে রমেশের নামটাও যদি আরও দুকথা বাড়িয়ে-গুছিয়ে লিখিয়ে দিতিস বোন,—আমার কথাটায় তখন তোরা ত কেউ কান দিলিনে।

রমা এমনি ম্লান হইয়া উঠিল যে বেণী দেখিতে পাইয়া কহিল, না, না, তোমাকে সাক্ষী দিতে যেতে হবে না। আর তাই যদি হয় তাতেই বা কি! জমিদারি করতে গেলে কিছুতেই হটলে ত চলে না।

রমা কোন কথা কহিল না।

বেণী কহিতে লাগিল, কিন্তু তাকে ত সহজে ধরা চলে না। তবে সেও এবার কম চাল চালল না দিদি! এই যে নূতন একটা ইস্কুল করেচে, এ নিয়ে আমাদের অনেক কষ্ট পেতে হবে। এমনিই তো মোছলমান প্রজারা জমিদার বলে মানতে চায় না, তার ওপর যদি লেখাপড়া শেখে তা হলে জমিদারি থাকা না-থাকা সমান হবে, তা এখন থেকে বলে রাখচি।

জমিদারির ভাল-মন্দ সম্বন্ধে রমা বরাবর বেণীর পরামর্শ মতই চলে; ইহাতে দুজনের কোন মতভেদ পর্যন্ত হয় না। আজ প্রথম রমা তর্ক করিল। কহিল, রমেশদার নিজের ক্ষতিও ত এতে কম নয়!

বেণীর নিজেরও এ সম্বন্ধে খটকা অল্প ছিল না। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা স্থির করিয়াছিল, তাহাই কহিল, কি জান রমা, এতে নিজের ক্ষতি ভাববার বিষয়ই নয়—আমরা দুজনে জব্দ হলেই ও খুশি। দেখচ না এসে পর্যন্ত কি রকম টাকা

ছড়াচ্ছে ? চারিদিকে ছোটলোকদের মধ্যে ছোটবাবু, ছোটবাবু, একটা রব উঠে গেছে। যেন ওই একটা মানুষ, আর আমরা দু-ঘর কিছুই নয়। কিন্তু বেশি দিন এ চলবে না। এই যে পুলিশের নজরে তাকে খাড়া করে দিয়েচ বোন, এতেই তাকে শেষ পর্যন্ত শেষ হতে হবে তা বলে দিচ্ছি, বলিয়া বেণী মনে মনে একটু আশ্চর্য হইয়াই লক্ষ্যকরিল, সংবাদটা শুনিয়াই তাহার কাছে যেরূপ উৎসাহ ও উত্তেজনা আশা করা গিয়াছিল, তাহার কিছুই পাওয়া গেল না। বরঞ্চ মনে হইল, সে হঠাৎ যেন একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল, আমি লিখিয়ে দিয়েছিলাম রমেশদা জানতে পেরেছেন ?

বেণী কহিল, ঠিক জানিনে। কিন্তু জানতে পারবেই। ভজুয়ার মকদ্দমায় সব কথাই উঠবে।

রমা আর কোন কথা কহিল না। চুপ করিয়া ভিতরে ভিতরে সে যেন একটা বড় আঘাত সামলাইতে লাগিল—তাহার কেবলই মনে উঠিতে লাগিল, রমেশকে বিপদে ফেলিতে সে-ই যে সকলের অগ্রণী, এই সংবাদটা আর রমেশের অগোচর রহিবে না। খানিক পরে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজকাল ওঁর নাম বুঝি সকলের মুখেই বড়দা ?

বেণী কহিল, শুধু আমাদের গ্রামেই নয়, শুনচি ওর দেখাদেখি আরও পাঁচ-ছটা গ্রামে স্কুল করবার, রাস্তা তৈরি করবার আয়োজন হচ্ছে। আজকাল ছোটলোকেরা সবাই বলাবলি করচে, সাহেবদের দেশে গ্রামে গ্রামে একটা-দুটো ইস্কুল আছে বলেই ওদের এত উন্নতি। রমেশ প্রচার করে দিয়েচে, যেখানে নূতন স্কুল হবে, সেইখানেই ও দু-শ' করে টাকা দেবে। ওর দাদামশাযের যত টাকা পেয়েচে সমস্তই ও এইতে ব্যয় করবে। মোচলমানেরা ত ওকে একটা পীর পয়গম্বর বলে ঠিক ক'রে বসে অ'ছে।

রমার নিজের বুকের ভিতর এই কথাটা একবার বিদ্যুতের মত আলো করিয়া খেলিয়া গেল, যদি তাহার নিজের নামটাও এই সঙ্গে যুক্ত হইযা থাকিতে পারিত ! কিন্তু মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই দ্বিগুণ আঁধারে তাহার সমস্ত অন্তরটা আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

বেণী কহিতে লাগিল, কিন্তু আমিও অল্পে ছাড়ব না। সে যে আমাদের সমস্ত প্রজা এমনি করে বিগড়ে তুলবে, আর জমিদার হয়ে আমরা চোখ মেলে মুখ বুজে দেখব, সে যেন কেউ স্বপ্নেও না ভাবে। এই ব্যাটা ভৈরব আচার্য্য এবার ভজুয়ার হয়ে সাক্ষী দিয়ে কি করে তার মেয়ের বিয়ে দেয়, সে আমি একবার ভাল করে দেখব। আরও একটা ফন্দি আছে, দেখি গোবিন্দখুড়ো কি বলে! তারপর দেশে ডাকাতি ত লেগেই আছে। এবার চাকরকে যদি জেলে পুরতে পারি ত, তার মনিবকে পুরতেও আমাদের বেশি বেগ পেতে হবে

না। সেই যে প্রথম দিনটিতেই তুমি বলেছিলে রমা, শত্রুতা করতে ইনিও কম করবেন না, সে যে এমন সত্যি হয়ে দাঁড়াবে তা আমিও মনে করিনি।

রমা কোন কথাই কহিল না। নিজের প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যদ্বাণী এমন বর্ণে বর্ণে সত্য হওয়ার বার্তা পাইয়াও যে নারীর মুখ অহংকারে উজ্জ্বল হইয়া উঠে না, বরঞ্চ নিবিড় কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়, সে যে তাহার কি অবস্থা, সে কথা বুঝিবার শক্তি বেণীর নাই। তা না থাকুক, কিন্তু জিনিসটা এতই স্পষ্ট যে কাহারই দৃষ্টি এড়াইবার সম্ভাবনা ছিল না—তাহারও এড়াইল না। মনে মনে একটু বিস্ময়াপন্ন হইযাই বেণী রান্নাঘরে যাইয়া মাসির সহিত দুই-একটা কথা কহিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল, রমা হাত নাড়িয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া মৃদুস্বরে কহিল, আচ্ছা বড়দা, রমেশদা যদি জেলেই যান, সে কি আমাদের নিজেদের ভারি কলঙ্কের কথা নয়?

বেণী অধিকতর আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

রমা কহিল, আমাদের আত্মীয়, আমরা যদি না বাঁচাই, সমস্ত লোক আমাদেরই ত ছি-ছি করবে।

বেণী জবাব দিল, যে যেমন কাজ করবে সে তার ফল ভুগবে, আমাদের কি?

রমা তেমনি মৃদুকণ্ঠে কহিল, রমেশদা সত্যিই ত আর চুরি-ডাকাতি করে বেড়ান না, বরং পরের ভালর জন্যেই নিজের সর্বস্ব দিচ্চেন, সে কথা ত কারো কাছে চাপা থাকবে না! তারপর আমাদের নিজেদেরও ত গাঁয়ের মধ্যে মুখ বার করতে হবে।

বেণী হি-হি করিয়া খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া কহিল, তোর হ'ল কি বল ত বোন?

রমা এই লোকটার সঙ্গে রমেশের মুখখানা মনে মনে একবার দেখিয়া লইয়া আর যেন সোজা করিয়া মাথা তুলিতেই পারিল না। কহিল, গাঁয়ের লোক ভয়ে মুখের সামনে কিছু না বলুক, আড়ালে বলবেই; তুমি বলবে, আড়ালে রাজার মাকেও ডান বলে, কিন্তু ভগবান ত আছেন! নিরপরাধীকে মিছে করে শাস্তি দেওয়ালে তিনি ত রেহাই দেবেন না।

বেণী কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া কহিল, হা রে আমার কপাল! সে ছোঁড়া বুঝি ঠাকুর-দেবতা কিছু মানে! শীতলাঠাকুরের ঘরটা পড়ে যাচ্ছে—মেরামত করবার জন্যে তার কাছে লোক পাঠাতে সে হাঁকিয়ে দিয়ে বলেছিল, যারা তোমাদের পাঠিয়েচে তাদের বল গে, বাজে খরচ করবার টাকা আমার নেই। শোন কথা! এটা তার কাছে বাজে খরচ? আর কাজের খরচ হচ্ছে মোচলমানদের ইস্কুল করে দেওয়া। তা ছাড়া বামুনের ছেলে—সন্ধ্যে-আহ্নিক কিছু করে না। শুনি মোচলমানের হাতে জল পর্যন্ত খায়। দুপাতা ইংরাজী

পড়ে আর কি তার জাতজন্ম আছে দিদি—কিছুই নেই। শাস্তি তার গেছে কোথা, সমস্তই তোলা আছে। সে একদিন সবাই দেখতে পাবে।

রমা আর বাদানুবাদ না করিয়া মৌন হইয়া রহিল বটে, কিন্তু রমেশের অনাচার এবং ঠাকুর-দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধার কথা স্মরণ করিয়া মনটা তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। বেণী নিজের মনে কথা কহিতে কহিতে চলিয়া গেল। রমা অনেকক্ষণ পর্যন্ত একভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজের ঘরে গিয়া মেঝের উপর ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল। সেদিন তাহার একাদশী। খাবার হাঙ্গামা নাই মনে করিয়া আজ যেন সে স্বস্তিবোধ করিল।

॥ চৌদ্দ ॥

বর্ষা শেষ হইয়া আগামী পূজার আনন্দ এবং ম্যালেরিয়াভীতি বাঙ্গলার পল্লীজননীর আকাশে, বাতাসে এবং আলোকে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল, রমেশও জ্বরে পড়িল। গত বৎসর এই রাক্ষসীর আক্রমণকে সে উপেক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু এ বৎসর আর পারিল না। তিন দিন জ্বর ভোগের পর আজ সকালে উঠিয়া খুব খানিকটা কুইনিন্‌ গিলিয়া লইয়া জানালার বাহিরে পীতাভ রৌদ্রের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, গ্রামের এই সমস্ত অনাবশ্যক ডোবা ও জঙ্গলের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীকে সচেতন করা সম্ভব কি না। এই তিন দিন মাত্র জ্বর ভোগ করিয়াই সে স্পষ্ট বুঝিয়াছিল, যা হউক কিছু একটা করিতেই হইবে। মানুষ হইয়া সে যদি নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া প্রতি বৎসর মাসের পর মাস মানুষকে এই রোগ ভোগ করিতে দেয়, ভগবান তাহাকে ক্ষমা করিবেন না। কয়েকদিন পূর্বে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া সে এইটুকু বুঝিয়াছিল, ইহার ভীষণ অপকারিতা সম্বন্ধে গ্রামের লোকেরা যে একেবারেই অজ্ঞ তাহা নহে; কিন্তু পরের ডোবা বুজাইয়া এবং জমির জঙ্গল কাটিয়া কেহই ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইয়া বেড়াইতে রাজী নহে। যাহার নিজের ডোবা ও জঙ্গল আছে, সে এই বলিয়া তর্ক করে যে এ-সকল তাহার নিজের কৃত নহে, বাপ-পিতামহের দিন হইতেই আছে। সুতরাং যাহাদের গরজ তাহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া লইতে পারে, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু নিজে সে এজন্য পয়সা এবং উদ্যম ব্যয় করিতে অপারগ। রমেশ সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল, এমন অনেক গ্রাম পাশাপাশি আছে যেখানে একটা গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইতেছে, অথচ আর একটায় ইহার প্রকোপ নাই বলিলেই হয়। ভাবিতেছিল, একটুকু সুস্থ হইলেই এইরূপ একটা গ্রাম সে নিজের চোখে গিয়া পরীক্ষা করিয়া আসিবে এবং তাহার পরে নিজের কর্তব্য স্থির করিবে। কারণ, তাহার নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছিল—

এই ম্যালেরিয়াহীন গ্রামগুলির জল-নিকাশের স্বাভাবিক সুবিধা কিছু আছেই, যাহা এমনিই কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়াও চেষ্টা করিয়া চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলে লোক দেখিতে পাইবে। অন্ততঃ তাহার নিতান্ত অনুরক্ত পিরপুরের মুসলমান প্রজারা চক্ষু মেলিবেই। তাহার ইন্‌জিনিয়ারিং শিক্ষা এতদিন পরে এমন একটা মহৎ কাজে লাগাইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া সে মনে মনে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ছোটবাবু!

অকস্মাৎ কান্নার সুরে আহ্বান শুনিয়া রমেশ মহাবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ভৈরব আচার্য ঘরের মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। তাহার সাত-আট বৎসরের একটি কন্যা সঙ্গে আসিয়াছিল, বাপের সঙ্গে যোগ দিয়া তাহার চীৎকারে ঘর ভরিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বাড়ির লোক যে যেখানে ছিল, দোরগোড়ায় আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। রমেশ কেমন যেন একরকম হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এই লোকটার কে মরিল, কি সর্বনাশ হইল, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, কেমন করিয়া কান্না থামাইবে, কিছু যেন ঠাহর পাইল না। গোপাল সরকার কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে কাছে আসিয়া ভৈরবের একটা হাত ধরিয়া টানিতেই ভৈরব উঠিয়া বসিয়া দুই বাহু দিয়া গোপালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ভয়ানক আর্তনাদ করিয়া উঠিল। এই লোকটা অতি অল্পতেই মেয়েদের মত কাঁদিয়া ফেলে স্মরণ করিয়া রমেশ ক্রমশঃ যখন অধীর হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় গোপালের বহুবিধ সান্ত্বনাবাক্যে ভৈরব অবশেষে চোখ মুছিয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিল এবং এই মহাশোকের হেতু বিবৃত করিতে প্রস্তুত হইল। বিবরণ শুনিয়া রমেশ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এতবড় অত্যাচার কোথাও কোনকালে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া সে কল্পনা করিতেও পারিল না। ব্যাপারটা এই—ভৈরবের সাক্ষ্যে ভজুয়া নিষ্কৃতি পাইলে তাহাকে পুলিশের সন্দেহদৃষ্টির বহির্ভূত করিতে রমেশ তাহাকে তাহার দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিল। আসামী পরিত্রাণ পাইল বটে, কিন্তু সাক্ষী ফাঁদে পড়িল। কেমন করিয়া যেন বাতাসে নিজের বিপদের বার্তা পাইয়া ভৈরব কাল সদরে গিয়া সন্ধান লইয়া অবগত হইয়াছে যে, দিন পাঁচ-ছয় পূর্বে বেণীর খুড়শ্বশুর রাধানগরের সনৎ মুখুয্যে ভৈরবের নামে সুদে-আসলে এগারশ' ছাব্বিশ টাকা সাত আনার ডিক্রি করিয়াছে এবং তাহার বাস্তুটা ক্রোক করিয়া লইয়াছে। ইহা একতরফা ডিক্রি নহে। যথারীতি সমন বাহির হইয়াছে, কে তাহা ভৈরবের নাম দস্তখত করিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং ধার্যদিনে আদালতে হাজির হইয়া নিজেকে ভৈরব বলিয়া স্বীকার করিয়া কবুল-জবাব দিয়া আসিয়াছে। ইহার ঋণ মিথ্যা, আসামী মিথ্যা, ফরিয়াদী মিথ্যা। এই সর্বব্যাপী মিথ্যার আশ্রয়ে সবল দুর্বলের যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে পথের ভিখারী করিয়া

বাহির করিয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছে ; অথচ সরকারের আদালতে এই অত্যাচারের প্রতিকারের উপায় সহজ নহে। অইনমত সমস্ত মিথ্যা ঋণ বিচারালয়ে গচ্ছিত না করিয়া কথাটি কহিবার জো নাই। মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও কেহ তাহাতে কর্ণপাত করিবে না। কিন্তু এত টাকা দরিদ্র ভৈরব কোথায় পাইবে যে, তাহা জমা দিয়া এই মহা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে ! সুতরাং রাজার আইন, আদালত, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট সমস্ত মাথার উপর থাকিলেও দরিদ্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিঃশব্দে মরিতে হইবে, অথচ সমস্তই যে বেণী ও গোবিন্দ গাঙ্গুলীর কাজ তাহাতে কাহারও সন্দেহমাত্র নাই এবং এই অত্যাচারের যত বড় দুর্গতি ভৈরবের অদৃষ্টে ঘটুক, গ্রামের সকলেই চুপি চুপি জল্পনা করিয়া ফিরিবে, কিন্তু একটি লোকও মাথা উঁচু করিয়া প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিবে না, কারণ তাহারা কাহারো সাতেও থাকে না পাঁচেও থাকে না এবং পরের কথায় কথা কহা তাহারা ভালই বাসে না। সে যাই হোক, রমেশ কিন্তু আজ নিঃসংশয়ে বুঝিল, পল্লীবাসী দরিদ্র প্রজার উপর অসংকোচে অত্যাচার করিবার সাহস ইহারা কোথায় পায় এবং কেমন করিয়া দেশের আইনকেই ইহারা কসাইয়ের ছুরির মত ব্যবহার করিতে পারে। সুতরাং অর্থবল এবং কূটবুদ্ধি একদিকে যেমন তাহাদিগকে রাজার শাসন হইতে অব্যাহতি দেয়, মৃতসমাজও তেমনি অন্যদিকে তাহাদের দুষ্কৃতির কোন দণ্ডবিধান করে না। তাই ইহারা সহস্র অন্যায় করিয়াও সত্যধর্মবিহীন মৃত পল্লীসমাজের মাথায় পা দিয়া এমন নিরুপদ্রবে এবং যথেচ্ছাচারে বাস করে।

আজ তাহার জ্যাঠাইমার কথাগুলো বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। সেদিন সেই যে তিনি মর্মান্তিক হাসিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, রমেশ, চুলোয় যাক গে তোদেরজাতবিচারের ভাল-মন্দ ঝগড়াঝাঁটি ; বাবা, শুধু আলো-জেবলে দে রে, শুধু আলো জেবলে দে ! গ্রামে গ্রামে লোক অন্ধকারে কানা হয়ে গেল ; একবার কেবল তাদের চোখ মেলে দেখবার উপায়টা করে দে বাবা ! তখন আপনি দেখতে পাবে তারা কোন্‌টা কালো, কোন্‌টা ধলো। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, যদি ফিরেই এসেছিস বাবা, তবে চলে আর যাসনে। তোরা মুখ ফিরিয়া থাকিস বলেই তোদের পল্লীজননীর এই দুর্দশা ! সত্যই ত। সে চলিয়া গেলে ত ইহার প্রতিকারের লেশমাত্র উপায় থাকিত না।

রমেশ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, হায় রে, এই আমাদের গর্বের ধন —বাঙালার শুদ্ধ, শান্ত, ন্যায়নিষ্ঠ পল্লী-সমাজ ! একদিন হয়ত যখন ইহার প্রাণ ছিল, তখন দুষ্টের শাসন করিয়া আশ্রিত নরনারীকে সংসারযাত্রার পথে নির্বিঘ্নে বহন করিয়া চলিবারও ইহার শক্তি ছিল।

কিন্তু আজ ইহা মৃত ; তথাপি অন্ধ পল্লীবাসীরা এই গুরুভারবিকৃত শবদেহটাকে পরিত্যাগ না করিয়া মিথ্যা মমতায় রাত্রিদিন মাথায় বহিয়া এমন দিনের

পর দিন ক্লান্ত, অবসন্ন ও নির্জীব হইয়া উঠিতেছে, কিছুতেই চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছে না। যে বস্তু আর্তকে রক্ষা করে না, শুধু বিপন্ন করে, তাহাকেই সমাজ বলিয়া কল্পনা করার মহাপাপ তাহাদিগকে নিয়ত রসাতলের পথেই টানিয়া নামাইতেছে।

রমেশ আরও কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া সহসা যেন ধাক্কা খাইয়া উঠিয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত টাকাটার একখানা চেক লিখিয়া গোপাল সরকারের হাতে দিয়া কহিল, আপনি সমস্ত বিষয় নিজে ভাল করে জেনে টাকাটা জমা দিয়ে দেবেন এবং যেমন করে হোক পুনর্বিচারের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে আসবেন। এমন ভয়ংকর অত্যাচার করবার সাহস তাদের আর যেন কোন দিন না হয়।

চেক হাতে করিয়া গোপাল সরকার ও ভৈরব উভয়ে কিছুক্ষণ যেন বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল। রমেশ পুনর্বার যখন নিজের বক্তব্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া কহিল এবং সে যে তামাশা করিতেছে না তা নিঃসন্দেহে যখন বুঝা গেল, তখন অকস্মাৎ ভৈরব ছুটিয়া আসিয়া পাগলের ন্যায় রমেশের দুই-পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া, চেঁচাইয়া, আশীর্বাদ করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিল যে রমেশের অপেক্ষা অল্প বলশালী লোকের পক্ষে নিজেকে মুক্ত করিয়া লওয়া সেদিন একটা কঠিন কাজ হইত। কথাটা গ্রামময় প্রচারিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। সকলেই বুঝিল বেণী এবং গোবিন্দ এবার সহজে নিষ্কৃতি পাইবে না। ছোটবাবু যে তাঁহার চিরশত্রুকে হাতে পাইবার জন্যই এত টাকা হাতছাড়া করিয়াছে, তাহা সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল। কিন্তু এ কথা কাহারও কল্পনা করাও সম্ভবপর ছিল না যে, দুর্বল ভৈরবের পরিবর্তে ভগবান তাহারই মাথার উপর এই গভীর দুষ্কৃতির গুরুভার তুলিয়া দিলেন যে তাহা স্বচ্ছন্দে বহিতে পারিবে।

তারপর মাসখানেক গত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে মনে মনে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া রমেশ এই একটা মাস তাহার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া এমনই উৎসাহের সহিত নানাস্থানে মাপজোপ করিয়া ফিরিতেছিল যে, আগমীকালই যে ভৈরবের মকদ্দমা তাহা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে অকস্মাৎ সে কথা মনে পড়িয়া গেল রোশনচৌকির সানায়ের সুরে। চাকরের কাছে সংবাদ পাইয়া রমেশ আশ্চর্য হইয়া গেল যে, আজ ভৈরব আচার্যের দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন। অথচ সে ত কিছুই জানে না। শুনিতে পাইল, ভৈরব আয়োজন মন্দ করে নাই। গ্রামসুদ্ধ সমস্ত লোককেই নিমন্ত্রণ করিয়াছে; কিন্তু রমেশকে কেহ নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিল কিনা সে খবর বাড়িতে কেহই দিতে পারিল না। শুধু তাই নয় তাহার স্মরণ হইল, এতবড় একটা মামলা ভৈরবের মাথার উপর আসন্ন হইয়া থাকা সত্ত্বেও সে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে একবার সাক্ষাৎ পর্যন্ত করিতে আসে নাই! ব্যাপার কি? কিন্তু এমন কথা তাহার মনে উদয়

হইয়াও হইল না যে, সংসারের সমস্ত লোকের মধ্যে ভৈরব তাহাকেই বাদ দিতে পারে। তাই নিজের এই অদ্ভুত আশংকায় নিজেই লজ্জিত হইয়া রমেশ তখনই একটা চাদর কাঁধে ফেলিয়া একেবারে সোজা আচার্যবাড়ির উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। বাহির হইতেই দেখিতে পাইল, বেড়ার ধারে দুই-তিনটা গ্রামের কুকুর জড় হইয়া এঁটো কলাপাতা লইয়া বিবাদ করিতেছে এবং অনতিদূরে রোশনচৌকি ওয়ালারা আগুন জবালাইয়া তামাক খাইতেছে এবং বাদ্যভাণ্ড উত্তপ্ত করিতেছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল উঠানে শতছিদ্রযুক্ত সামিয়ানা খাটানো এবং সমস্ত গ্রামের সম্বল পাঁচ-ছয়টা কেরোসিনের বহু পুরাতন বাতি মুখুয্যে ও ঘোষাল-বাটী হইতে চাহিয়া আনিয়া জবালানো হইয়াছে। তাহারা অল্প-আলোক এবং অপর্যাপ্ত ধূম উদ্‌গিরণ করিয়া সমস্ত স্থানটাকে দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে। খাওয়ানো সমাধা হইয়া গিয়াছিল—বেশি লোক আর ছিল না। পাড়ার মুরুব্বিরা তখন যাই-যাই করিতেছিলেন এবং ধর্মদাস হরিহর রায়কে আরও একটু-খানি বসিতে পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। গোবিন্দ গাঙ্গুলী একটুখানি সরিয়া বসিয়া কে একজন চাষার ছেলের সহিত নিরিবিলি আলাপে রত ছিলেন। এমনি সময়ে রমেশ দুঃস্বপ্নের মত একেবারে প্রাঙ্গণের বুকের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র ইহাদের মুখও যেন একমুহূর্তে মসীবর্ণ হইয়া গেল, শত্রু-পক্ষীয় এই দুইটা লোককে এই বাটীতেই এমনভাবে যোগ দিতে দেখিয়া রমেশের মুখও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল না। কেহই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতে অগ্রসর হইল না—এমন কি, একটা কথা পর্যন্ত কহিল না। ভৈরব নিজে সেখানে ছিল না। খানিক পরে সে বাটীর ভিতর হইতে কি একটা কাজে—বলি গোবিন্দ-দা, বলিয়া বাহির হইয়াই উঠানের মাঝখানে যেন ভূত দেখিতে পাইল এবং পরক্ষণেই ছুটিয়া বাটীর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। রমেশ শুষ্কমুখে একাকী যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন প্রচণ্ড বিস্ময়ে তাহার মন অসাড় হইয়া গিয়াছিল। পিছনে ডাক শুনিল, বাবা রমেশ।

ফিরিয়া দেখিল, দীনু হনহন করিয়া আসিতেছে। কাছে আসিয়া কহিল, চল বাবা, বাড়ি চল।

রমেশ একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল মাত্র।

চলিতে চলিতে দীনু বলিতে লাগিল, তুমি ওর যে উপকার করেচ বাবা, সে ওর বাপ-মা করত না। এ কথা সবাই জানে, কিন্তু উপায় ত নেই। কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে আমাদের সকলকেরই ঘর করতে হয়; তাই তোমাকে নেমন্তন্ন করতে গেলে—বুঝলে না বাবা—ভৈরবকেও নেহাত দোষ দেওয়া যায় না—তোমরা সব আজকালকার শহরের ছেলে—জাত-টাত তেমন ত কিছু মানতে চাও না—তাইতেই বুঝলে না বাবা—দুদিন পরে, ওর ছোটমেয়েটিও প্রায় বারো বছরের হ'ল

ত—পার করতে হবে ত বাবা? আমাদের সমাজের কথা সবই জান বাবা—বুঝলে না বাবা—

রমেশ অধীরভাবে কহিল, আজ্ঞে হাঁ, বুঝেচি।

রমেশের বাড়ির সদর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দীনু খুশি হইয়া কহিলেন, বুঝবে বৈ কি বাবা, তোমরা ত আর অবুঝ নও। ও ব্রাহ্মণকেই বা দোষ দিই কি করে—আমাদের বুড়োমানুষের পরকালের চিন্তাটা—

আজ্ঞে হাঁ, সে ত ঠিক কথা; বলিয়া রমেশ তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করিল। গ্রামের লোকে তাহাকে একঘরে করিয়াছে, তাহা বুঝিতে তাহার আর বাকী রহিল না। নিজের ঘরের মধ্যে আসিয়া ক্ষোভে, অভিমানে তাহার দুই চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল। আজ এইটা তাহার সবচেয়ে বেশি বাজিল যে, বেণী ও গোবিন্দকেই ভৈরব আজ সমাদরে ডাকিয়া আনিয়াছে এবং গ্রামের লোক সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও ভৈরবের এই ব্যবহারটা শুধু মাপ করে নাই, সমাজের খাতিরে রমেশকে সে যে আহ্বান পর্যন্ত করে নাই, তাহার এই কাজটাকে প্রশংসার চক্ষে দেখিতেছে।

হা ভগবান! সে একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, এ কৃতঘ্ন জাতের, এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিসে! এত বড় নিষ্ঠুর অপমান কি ভগবান তুমিই ক্ষমা করতে পারবে?

॥ পনর ॥

এমনি একটা আশংকা যে রমেশের মাথায় একেবারে আসে নাই তাহা নহে। তথাপি পরদিন সন্ধ্যার সময়ে গোপাল সরকার সদর হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন সত্য সত্যই জানাইল যে, ভৈরব আচার্য তাহাদের মাথার উপরেই কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ করিয়াছে অর্থাৎ সে মকদ্দমায় হাজির হয় নাই এবং তাহা এক-তরফা হইয়া ডিসমিস হইয়া গিয়া তাহাদের প্রদত্ত জমা টাকাটা বেণী প্রভৃতির হস্তগত হইয়াছে, তখন এক মুহূর্তেই রমেশের ক্রোধের শিখা বিদ্যুদ্বেগে তাহার পদতল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। সেদিন ইহাদের জাল ও জুয়াচুরি দমন করিতে যে মিথ্যা ঋণ সে ভৈরবের হইয়া জমা দিয়াছিল, মহা-পাপিষ্ঠ ভৈরব তাহার দ্বারাই নিজের মাথা বাঁচাইয়া লইয়া পুনরায় বেণীর সহিতই সখ্য স্থাপন করিয়াছে। তাহার এই কৃতঘ্নতা কল্যকার অপমানকেও বহু ঊর্ধ্বে ছাপাইয়া আজ রমেশের মাথার ভিতরে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। রমেশ যেমন ছিল তেমনি খাড়া উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। আত্মসংবরণের কথাটা তাহার মনেও হইল না। প্রভুর রক্তচক্ষু দেখিয়া ভীত হইয়া গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কি কোথাও যাচ্চেন?

আসচি, বলিয়া রমেশ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। ভৈরবের বহির্বাটীতে ঢুকিয়া দেখিল কেহ নাই। ভিতরে প্রবেশ করিল। তখন আচার্যগৃহিণী সন্ধ্যাদীপ-

হাতে প্রাঙ্গণের তুলসীমঞ্চমূলে আসিতেছিলেন; অকস্মাৎ রমেশকে সম্মুখে দেখিয়া একেবারে জড়সড় হইয়া গেলেন। সে কখনও আসে না, আজ কেন আসিয়াছে তাহা মনে করিতেই ভয়ে তাঁহার হৃৎপিণ্ড কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া আসিল।

রমেশ তাঁহাকেই প্রশ্ন করিল, আচাৰ্য্যিমশাই কৈ?

গৃহিণী অব্যক্তস্বরে যাহা বলিলেন তাহা শোনা গেল না বটে, কিন্তু বুঝা গেল তিনি ঘরে নাই। রমেশের গায়ে একটা জামা অবধি ছিল না। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে তাহার মুখও ভাল দেখা যাইতেছিল না। এমন সময়ে ভৈরবের বড়মেয়ে লক্ষ্মী ছেলে কোলে গৃহের বাহির হইয়াই এই অপরিচিত লোকটাকে দেখিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, কে মা?

তাহার জননী পরিচয় দিতে পারিলেন না, রমেশও কথা কহিল না।

লক্ষ্মী ভয় পাইয়া চেঁচাইয়া ডাকিল, বাবা, কে একটা লোক উঠানে এসে দাঁড়িয়েচে, কথা কয় না।

কে রে? বলিয়া সাড়া দিয়া তাহার পিতা ঘরের বাহিরে আসিয়াই একেবারে কাঠ হইয়া গেল। সন্ধ্যার ম্লান ছায়াতেও সেই দীর্ঘ ঋজুদেহ চিনিতে তাহার বাকী রহিল না।

রমেশ কঠোরস্বরে ডাকিল নেমে আসুন, বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজেই উঠিয়া গিয়া বজ্রমুষ্টিতে ভৈরবের একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। কহিল, কেন এমন কাজ করলেন?

ভৈরব কাঁদিয়া উঠিল, মেরে ফেলল রে লক্ষ্মী, বেণীবাবুকে খবর দে।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি সুদ্ধ ছেলেমেয়ে চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং চোখের পলকে সন্ধ্যার নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া বহুকণ্ঠের গগনভেদী কান্নার রোলে সমস্ত পাড়া ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

রমেশ তাহাকে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়া কহিল, চুপ। বলুন, কেন এ কাজ করলেন?

ভৈরব উত্তর দেবার চেষ্টামাত্র না করিয়া একভাবে চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইতে লাগিল এবং নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য টানা-হেঁচড়া করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে পাড়ার মেয়ে-পুরুষে প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং তামাশা দেখিতে আরও বহু লোক ভিড় করিয়া ভিতরে ঢুকিতে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। কিন্তু ক্রোধান্ধ রমেশ সেদিকে লক্ষ্যই করিল না। শতচক্ষুর কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে উন্মত্তের মত ভৈরবকে ধরিয়া একভাবে নাড়া দিতে লাগিল। একে রমেশের গায়ের জোর অতিরঞ্জিত হইয়া প্রবাদের মত দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে তাহার চোখের পানে চাহিয়া এই একবাড়ির লোকের মধ্যে এমন সাহস কাহারও হইল না যে, হতভাগ্য ভৈরবকে ছাড়াইয়া দেয়। গোবিন্দ বাড়ি ঢুকিয়াই

ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল। বেণী উঁকি মারিয়াই সরিতেছিল, ভৈরব দেখিতে পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—বড়বাবু বড়বাবু—

বড়বাবু কিন্তু কর্ণপাতও করিল না, চোখের নিমেষে কোথায় মিলাইয়া গেল।

সহসা জনতার মধ্যে একটুখানি পথের মত হইল, পরক্ষণেই রমা দ্রুতপদে আসিয়া রমেশের হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, হয়েচে—এবার ছেড়ে দাও।

রমেশ তাহার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, কেন?

রমা দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্ফুট-রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, এত লোকের মাঝখানে তোমার লজ্জা করে না, কিন্তু আমি যে লজ্জায় মরে যাই।

রমেশ প্রাঙ্গণপূর্ণ লোকের পানে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ ভৈরবের হাত ছাড়িয়া দিল।

রমা তেমনি মৃদুস্বরে কহিল, বাড়ি যাও।

রমেশ দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহির হইয়া গেল। হঠাৎ এ যেন একটা ভোজবাজি হইয়া গেল। কিন্তু সে চলিয়া গেলে রমার প্রতি তাহার এই নিরতিশয় বাধ্যতায় সবাই যেন কি একরকম মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল এমন জিনিসটার এত আড়ম্বরে আরম্ভ হইয়া এভাবে শেষ হইয়া যাওয়াটা পাড়ার লোকের কাহারই যেন মনঃপূত হইল না।

লোকজন চলিয়া গেল। গোবিন্দ গাঙ্গুলী আত্মপ্রকাশ করিয়া একটা আঙ্গুল তুলিয়া মুখখানা অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া কহিল, বাড়ি চড়াও হয়ে যে আধমরা করে দিয়ে গেল, এর কি করবে সেই পরামর্শ করো।

ভৈরব দুই-হাঁটু বুকের কাছে জড় করিয়া বসিয়া হাঁপাইতেছিল, নিরুপায়ভাবে বেণীর মুখপানে চাহিল। রমা তখন যায় নাই। বেণীর অভিপ্রায় অনুমান করিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, কিন্তু এ পক্ষের দোষও ত কম নেই বড়দা? তা ছাড়া হয়েচেই বা কি যে এই নিয়ে হৈ-চৈ করতে হবে।

বেণী ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া কহিল, বল কি রমা!

ভৈরবের বড় মেয়ে তখনও একটা খুঁটি আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। সে দলিতা ফণিণীর মত একেবারে গর্জাইয়া উঠিল, তুমি ত ওর হয়ে বলবেই রমাদিদি। তোমার বাপকে কেউ ঘরে ঢুকে মেরে গেলে কি করতে বল ত?

তাহার গর্জনে রমা প্রথমটা চমকিয়া গেল। সে যে পিতার মুক্তির জন্য কৃতজ্ঞ নয়- তা না হয় নাই হইল; কিন্তু তাহার তীব্রতার ভিতর হইতে এমন একটা কটু শ্লেষের ঝাঁজ আসিয়া রমার গায়ে লাগিল যে সে পরমুহূর্তেই জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, আমার বাপ ও তোমার বাপে অনেক তফাত লক্ষ্মী, তুমি সে তুলনা ক'রো না; কিন্তু আমি কারও হয়েই কোনও কথা বলিনি, ভালর জন্যেই বলেছিলাম।

লক্ষ্মী পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, ঝগড়ায় অপটু নহে। সে তাড়িয়া আসিয়া বলিল, বটে! ওর হয়ে কোঁদল করতে তোমার লজ্জা করে না? বড়লোকের মেয়ে বলে

কেউ ভয়ে কথা কয় না—নইলে কে না শুনেচে ? তুমি বলে তাই মুখ দেখাও, আর কেউ হলে গলায় দড়ি দিত।

বেণী লক্ষ্মীকে একটা তাড়া দিয়া বলিল, তুই থাম না লক্ষ্মী ! কাজ কি ও-সব কথায় ?

লক্ষ্মী কহিল, কাজ নেই কেন ? যার জন্যে বাবাকে এত দুঃখ পেতে হ'ল, তার হয়েই উনি কোঁদল করবেন ? বাবা যদি মারা যেতেন ?

রমা নিমেষের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল মাত্র। বেণীর কৃত্রিম ক্রোধের স্বর তাহাকে আবার প্রজ্বলিত করিয়া দিল। সে লক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া কহিল, লক্ষ্মী, ওর মত লোকের হাতে মরতে পাওয়াও ভাগ্যের কথা ; আজ মারা পড়লে তোমার বাবা স্বর্গে যেতে পারত।

লক্ষ্মীও জ্বলিয়া উঠিল, ওঃ, তাইতেই বুঝি তুমি মরেচ রমাদিদি ?

রমা আর জবাব দিল না। তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বেণীর প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কথাটা কি তুমিই বল ত বড়দা ? বলিয়া সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি যেন অন্ধকার ভেদ করিয়া বেণীর বুকের ভিতর পর্যন্ত দেখিতে লাগিল।

বেণী ক্ষুব্ধভাবে বলিল, কি করে জানব বোন ! লোকে কত কথা বলে—তাতে কান দিলে ত চলে না।

লোকে কি বলে ?

বেণী পরম তাচ্ছিল্যভাবে কহিল, বললেই বা রমা, লোকের কথাতে ত আর গায়ে ফোসকা পড়ে না ; বলুক না।

তাহার এই কপট সহানুভূতি রমা টের পাইল। একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার গায়ে হয়ত কিছুতেই ফোসকা পড়ে না, কিন্তু সকলের গায়ে ত গণ্ডারের চামড়া নেই ! কিন্তু লোককে এ কথা বলাচ্চে কে ? তুমি ?

আমি ?

রমা ভিতরের দুর্নিবার ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিল, তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। পৃথিবীতে কোন দুষ্কর্মই ত তোমার বাকী নেই—চুরি, জুয়াচুরি, জাল, ঘরে আগুন দেওয়া সবই হয়ে গেছে, এটাই বা বাকী থাকে কেন ?

বেণী হতবুদ্ধি হইয়া হঠাৎ কথা কহিতেই পারিল না।

রমা কহিল, মেয়েমানুষের এর বড় সর্বনাশ যে আর নেই, সে বোঝবার তোমার সাধ্য নেই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ কলঙ্ক রটিয়ে তোমার লাভ কি ?

বেণী ভীত হইয়া বলিল, আমার লাভ কি হবে ! লোকে যদি তোমাকে রমেশের বাড়ি থেকে ভোরবেলা বার হতে দেখে—আমি করব কি ?

রমা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল, এত লোকের সামনে আমি আর বলতে চাইনে। কিন্তু তুমি মনে ক'রো না বড়দা, তোমার মনের ভাব আমি টের পাইনি! কিন্তু এ নিশ্চয় জেনো—আমি মরবার আগে তোমাকেও জ্যান্ত রেখে যাব না।

আচার্যগৃহিণী এতক্ষণ নিঃশব্দে কোথাও দাঁড়াইয়া ছিলেন; সরিয়া আসিয়া রমার একটা বাহু ধরিয়া ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদুস্বরে বলিলেন, পাগল হয়েচ মা, এখানে তোমাকে না জানে কে? নিজের কন্যার উদ্দেশ্যে বলিলেন, লক্ষ্মী, মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের নামে এ অপবাদ দিসনে রে, ধর্ম সইবেন না। আজ ইনি তোদের যে উপকার করেচেন, তোরা মানুষের মেয়ে হলে তা টের পেতিস, বলিয়া টানিয়া রমাকে ঘরে লইয়া গেলেন। আচার্যগৃহিণীর স্বামীর উদ্দেশে এই কঠোর শ্লেষ এবং নিরপেক্ষ সত্য-বাদিতায় উপস্থিত সকলেই যেন কুণ্ঠিত হইয়া সরিয়া পড়িল।

এই ঘটনার কার্য-কারণ যত বড় এবং যাই হোক, নিজের কদাকার অসংযমে রমেশের শিক্ষিত ভদ্র অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ দুইটা দিন এমনি সংকুচিত হইয়া রহিল যে, সে বাটীর বাহির হইতেই পারিল না। তথাপি এত লোকের মধ্য হইতে রমা যে স্বেচ্ছায় তাহার লজ্জার অংশ লইতে আসিয়াছিল, এই চিন্তাটা তাহার সমস্ত লজ্জার কালোমেঘের গায়ে দিগন্তলুপ্ত অতি ঈষৎ বিদ্যুৎস্ফুরণের মত ক্ষণে ক্ষণে যেন সৌন্দর্য ও মাধুর্যের দীপ্তরেখা আঁকিয়া দিতেছিল। তাই তাহার গ্লানির মধ্যেও পরিতৃপ্তির আনন্দ ছিল। এই দুঃখ ও সুখের বেদনা লইয়া সে যখন আরও কিছুদিন তাহার নির্জন গৃহের মধ্যে অজ্ঞাতবাসে সংকল্প করিতে-ছিল, তখন তাহাকে উপলক্ষ করিয়া বাহিরে যে আর একজনের মাথার উপর নিরবচ্ছিন্ন লজ্জা ও অপমানের পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

কিন্তু লুকাইয়া থাকিবার সুযোগ তাহার ঘটিল না। আজ বৈকালে পিরপুরের মুসলমান প্রজারা তাহাদের পঞ্চায়েতের বৈঠকে উপস্থিত হইবার জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিল। এ বৈঠকের আয়োজন রমেশ নিজেই কিছুদিন পূর্বে করিয়া আসিয়াছিল। সেইমত তাহারা আজ একত্র হইয়া ছোটবাবুর জন্যই অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে বলিয়া যখন সংবাদ দিয়া গেল, তখন তাহাকে যাইবার জন্য উঠিতে হইল। কেন তাহা বলিতেছি।

রমেশ সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল, প্রত্যেক গ্রামেই কৃষকদিগের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; অনেকেরই একফোঁটা জমিজায়গা নাই; পরের জমিতে খাজনা দিয়া বাস করে এবং পরের জমিতে 'জন' খাটিয়া উদরান্নের সংস্থান করে।

দু'দিন কাজ না পাইলে কিংবা অসুখে-বিসুখে কাজ করিতে না পারিলেই সপরিবারে উপবাস করে। খোঁজ করিয়া আরও অবগত হইয়াছিল যে, ইহাদের অনেকেরই একদিন সঙ্গতি ছিল, শুধু ঋণের দায়েই সমস্ত গিয়াছে। ঋণের ব্যবস্থাও সোজা নয়। মহাজনেরা জমি বাঁধা রাখিয়া ঋণ দেয় এবং সুদের হার এত অধিক যে, একবার যে-কোন কৃষক সামাজিক ক্রিয়াকর্মের দায়েই হোক বা অনাবৃষ্টির জন্যই হোক, ঋণ করিতে বাধ্য হয়, সে আর সামলাইয়া উঠিতে পারে না। প্রতি বৎসরেই তাহাকে সেই মহাজনের দ্বারে গিয়া হাত পাতিতে হয়। এ বিষয়ে হিন্দ-মুসলমানের একই অবস্থা। কারণ মহাজনেরা প্রায় হিন্দু। রমেশ শহরে থাকিতে এ সম্বন্ধে বই পড়িয়া যাহা জানিয়াছিল, গ্রামে আসিয়া তাহাই চোখে দেখিয়া প্রথমটা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার অনেক টাকা ব্যাংকে পড়িয়া ছিল। এই টাকা এবং আরও কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া এই-সকল দুর্ভাগাদের মহাজনের কবল হইতে উদ্ধার করিতে সে কোমর বাঁধিয়া লাগিল। কিন্তু দুই-একটা কাজ করিয়াই ধাক্কা খাইয়া দেখিল যে, এই-সকল দরিদ্রদিগকে সে যতটা অসহায় ও কৃপাপাত্র বলিয়া ভাবিয়াছিল, অনেক সময়েই তাহা ঠিক নয়। ইহারা দরিদ্র, নিরুপায় এবং অল্পবুদ্ধিজীবী বটে, কিন্তু বজ্জাতি বুদ্ধিতে ইহারা কম নহে। ধার করিয়া শোধ না দিবার প্রবৃত্তিইহাদের যথেষ্ট প্রবল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরলও নয়, সাধুও নয। মিথ্যা বলিতে ইহারা অধোবদন হয় না এবং ফাঁকি দিতে জানে। প্রতিবেশীর স্ত্রী-কন্যার সম্বন্ধে সৌন্দর্য-চর্চার শখও মন্দ নাই। পুরুষের বিবাহ হওয়া কঠিন ব্যাপার ; অথচ নানা বয়সের বিধবার প্রতি গৃহস্থ ভারাক্রান্ত। তাই নৈতিক স্বাস্থ্যও অতিশয় দূষিত। সমাজ ইহাদিগের আছে —তাহার শাসনও কম নয়, কিন্তু পুলিশের সহিত চোরের যে সম্বন্ধ, সমাজের সহিত ইহাবা ঠিক সেই সম্বন্ধ পাতাইয়া রাখিয়াছে। অথচ সর্বসমেত ইহারা এমন পীড়িত, এত দুর্বল, এমন নিঃস্ব যে, রাগ করিয়া বসিয়া থাকাও অসম্ভব। বিদ্রোহী বিপথগামী সন্তানের প্রতি পিতার মনোভাব যা হয়, রমেশের অন্তরটা ঠিক তেমনি করিতেছিল বলিয়াই আজিকার সন্ধ্যায় সে পিরপুরের নূতন ইস্কুল-ঘরে পঞ্চায়েত আহ্বান কবিয়াছিল। কিছুক্ষণ হইল সন্ধ্যার ঝাপসা ঘোর কাটিয়া গিয়া দশমীর জ্যোৎস্নায় জানালার বাহিরে মুক্ত প্রান্তরের এদিক ওদিক ভরিয়া গিয়াছিল। সেই দিকে চাহিয়া রমেশ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াও যাই-যাই করিয়া বিলম্ব করিতেছিল। এমন সময়ে রমা আসিয়া তাহার দোর গোড়ায় দাঁড়াইল। সে স্থানটায় আলো ছিল না, রমেশ বাটীর দাসী মনে করিয়া কহিল, কি চাও ?

আপনি কি বাইরে যাচ্ছেন ?

রমেশ চমকিয়া উঠিল—এ কি রমা ? এমন সময় যে !

যে হেতু তাহাকে সন্ধ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য ; কিন্তু যেজন্য সে আসিয়াছিল, সে অনেক কথা। অথচ কি করিয়া যে আরম্ভ করিবে ভাবিয়া না পাইয়া রমা স্থির হইয়া রহিল। রমেশও কথা কহিতে পারিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রমা প্রশ্ন করিল, আপনার শরীর এখন কেমন আছে ?

ভাল নয়। আবার রোজ রাত্রেই জ্বর হচ্ছে।

তা হলে কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে ত ভাল হয়।

রমেশ হাসিয়া কহিল, ভাল ত হয় জানি, কিন্তু যাই কি করে ?

তাহার হাসি দেখিয়া রমা বিরক্ত হইল। কহিল, আপনি বলবেন আপনার অনেক কাজ, কিন্তু এমন কি কাজ আছে যা নিজের শরীরের চেয়েও বড় ?

রমেশ পূর্বের মতই হাসিয়া জবাব দিল, নিজের দেহটা যে ছোট জিনিস তা আমি বলিনে। কিন্তু এমন কাজ মানুষের আছে, যা এই দেহটার চেয়ে অনেক বড়—কিন্তু সে ত তুমি বুঝবে না রমা।

রমা মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি বুঝতেও চাইনে। কিন্তু আপনাকে আর কোথাও যেতেই হবে। সরকার মশাইকে বলে দিয়ে যান, আমি তাঁর কাজকর্ম দেখবো।

রমেশ বিস্মিত হইয়া কহিল, তুমি আমার কাজকর্ম দেখবে ? কিন্তু—

কিন্তু কি ?

কিন্তু কি জানো রমা, আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারব কি ?

রমা অসঙ্কোচে তৎক্ষণাৎ কহিল, ইতরে পারে না, কিন্তু আপনি পারবেন।

তাহার দৃঢ়কণ্ঠের এই অভাবনীয় উক্তিতে রমেশ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। ক্ষণেক মৌন থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, ভেবে দেখি।

রমা মাথা নাড়িয়া কহিল, না, ভাববার সময় নেই, আজই আপনাকে আর কোথাও যেতে হবে। না গেলে—বলিতে বলিতেই সে স্পষ্ট অনুভব করিল রমেশ কিলিত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, অকস্মাৎ এমন করিয়া না পালাইলে বিপদ যে কি ঘটিতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। রমেশ ঠিকই অনুমান করিল ; কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, ভাল, তাই যদি যাই তাতে তোমার লাভ কি ? আমাকে বিপদে ফেলতে তুমি নিজেও ত কম চেষ্টা করনি যে, আজ আর একটা বিপদে সতর্ক করতে এসেচ ! সে-সব কাণ্ড এত পুরানো হয়নি যে, তোমার মনে নেই। বরং খুলে বল, আমি গেলে তোমার নিজের কি সুবিধে হয়, আমি চলে যেতে হয়ত রাজী হতেও পারি, বলিয়া সে যে-উত্তরের প্রত্যাশায় রমার অস্পষ্ট মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহা পাইল না।

কতবড় অভিমান যে রমার বুক জুড়িয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তাহাও জানা

গেল না ; রমেশের নিষ্ঠুর বিদ্রূপের আঘাতে মুখ যে তাহার কিরূপ বিবর্ণ হইয়া রহিল, তাহাও অন্ধকারে লক্ষ্যগোচর হইল না। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রমা আপনাকে সামলাইয়া লইল। পরে কহিল, আচ্ছা খুলেই বলচি। আপনি গেলে আমার লাভ কিছুই নেই, কিন্তু না গেলে অনেক ক্ষতি। আমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

রমেশ শুষ্ক হইয়া কহিল, এই ? কিন্তু সাক্ষী না দিলে ?

রমা একটুখানি থামিয়া কহিল, না দিলে দুদিন পরে আমার মহামায়ার পুজোয় কেউ আসবে না, আমার যতীনের উপনয়নে কেউ খাবে না—আমার বার-ব্রত—এরূপ দুর্ঘটনার সম্ভবনা স্মরণমাত্র রমা শিহরিয়া উঠিল।

রমেশের আর না শুনিলেও চলিত, কিন্তু থাকিতে পারিল না কহিল, তার পরে ?

রমা ব্যাকুল হইয়া বলিল, তারও পরে ? না তুমি যাও—আমি মিনতি করচি রমেশদা, আমাকে সব দিকে নষ্ট ক'রো না ; তুমি যাও—যাও এ দেশ থেকে।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। ইতিপূর্বে যেখানে যে-কোন অবস্থায় হোক রমাকে দেখিলেই রমেশের বুকের রক্ত অশান্ত হইয়া উঠিত। মনে মনে শত যুক্তি প্রয়োগ করিয়া, নিজের অন্তরকে সহস্র কটূক্তি করিয়াও তাহাকে শান্ত করিতে পারিত না। হৃদয়ের এই নীরব বিরুদ্ধতায় সে দুঃখ পাইত, লজ্জা অনুভব করিত, ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে বশে আনিতে পারিত না। বিশেষ করিয়া আজ এইমাত্র নিজের গৃহের মধ্যে সেই রমাকে অকস্মাৎ একাকিনী উপস্থিত হইতে দেখিয়া কল্যকার কথা স্মরণ করিয়াই তাহার হৃদয়-চাঞ্চল্য একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল। রমার শেষ কথায় এতদিন পরে আজ সেই-হৃদয় স্থির হইল। রমার ভয়-ব্যাকুল নিবন্ধতায় অখণ্ড স্বার্থপরতার চেহারা এতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, আহার অন্ধ হৃদয়েরও আজ চোখ খুলিয়া গেল।

রমেশ গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু আজ আর সময় নেই। কারণ, আমার পালাবার হেতুটা যত বড়ই তোমার কাছে হোক, আজ রাত্রিটা আমার কাছে তার চেয়েও গুরুতর। তোমার দাসীকে ডাকো, আমাকে এখনই বার হতে হবে।

রমা আস্তে আস্তে বলিল, আজ কি কোনমতেই যাওয়া হতে পারে না ?

না। তোমার দাসী গেল কোথায় ?

কেউ আমার সঙ্গে আসেনি।

রমেশ আশ্চর্য হইয়া বলিল, সে কি কথা ! এখানে একা এলে কোন্ সাহসে ? একজন দাসী পর্যন্ত সঙ্গে করে আনোনি।

রমা তেমনি মৃদুস্বরে কহিল, তাতেই বা কি হ'ত? সেও ত আমাকে তোমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারত না!

তা না পারুক, লোকের মিথ্যা দুর্নাম থেকে ত বাঁচাতে পারত। রাত্রি কম হয়নি রাণী!

সেই বহুদিনের বিস্মৃত নাম! রমা সাহসা বলিতে গেল. দুর্নামের বাকী নেই রমেশদা, কিন্তু আপনাকে সংবরণ করিয়া শুধু কহিল, তাতেও ফল হ'ত না রমেশদা। অন্ধকার রাত্রি নয়—আমি বেশ যেতে পারব, বলিয়া আর কোন কথার জন্য অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

॥ ষোল ॥

প্রতি বৎসর রমা ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব করিত। এবং প্রথম পূজার দিনেই গ্রামের সমস্ত চাষাভুষা প্রভৃতিকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইত। ব্রাহ্মণ-বাটীতে মায়ের প্রসাদ পাইবার জন্য এমন হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত যে, রাত্রি একপ্রহর পর্যন্ত ভাঁড়ে-পাতায় এঁটোতে-কাটাতে বাড়িতে পা ফেলিবার জায়গা থাকিত না। শুধু হিন্দু নয়, পিরপুরের প্রজারাও ভিড় করিতে ছাড়িত না। এবারও সে নিজে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আয়োজনের ত্রুটি করে নাই। চণ্ডী-মণ্ডপে প্রতিমা ও পূজার সাজসরঞ্জাম। নীচে উৎসবের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সপ্তমী-পূজা যথাসময়ে সমাধা হইয়া গিয়াছে। ক্রমে মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে গড়াইয়া তাহাও শেষ হইতে বসিয়াছে। আকাশে সপ্তমীর খণ্ডচন্দ্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু মুখুয্যে বাড়ির মস্ত উঠান জনকয়েক ভদ্রলোক ব্যতীত একেবারে শূন্য খাঁ-খাঁ করিতেছে। বাড়ির ভিতরে অন্নের বিরাট স্তূপ ক্রমে জমাট বাঁধিয়া কঠিন হইতে লাগিল, ব্যঞ্জনের রাশি শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত একজন চাষাও মায়ের প্রসাদ পাইতে বাড়িতে পা দিল না।

ইস্! এত আহার্য-পেয়ে নষ্ট করে দিচ্চে দেশের ছোটলোকের দল? এত বড় স্পর্ধা! বেণী হুঁকা হাতে একবার ভিতরে, একবার বাহিরে হাঁকাহাঁকি দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতে লাগিল—বেটাদের শেখাবো - চাল কেটে তুলে দেবো—এমন করবো, তেমন করবো, ইত্যাদি। গোবিন্দ, ধর্মদাস, হালদার প্রভৃতি এরা রুষ্টমুখে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আন্দাজ করিতে লাগিল, কোন্ শালার কারসাজিতে এই কাণ্ডটা ঘটিয়াছে! হিন্দু-মুসলমান একমত হইয়াছে, এও ত বড় আশ্চর্য! এদিকে অন্দরে মাসি ত একেবারে দুর্বার হইয়া উঠিয়াছেন।

সেও এক মহামারী ব্যাপার। এই তুমুল হাঙ্গামার মধ্যে শুধু একজন নীরব হইয়া আছে—সে নিজে রমা। একটি কথাও সে কাহারো বিরুদ্ধে কহে নাই, কাহাকেও দোষ দেয় নাই, একটা আক্ষেপ বা অভিযোগের কণামাত্রও এখন পর্যন্ত তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। একি সেই রমা? সে যে অতিশয় পীড়িত তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সে নিজে স্বীকার করে না—হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। রোগে রূপ নষ্ট করে—সে যাক্। কিন্তু সে অভিমান নাই, সে রাগ নাই, সে জিদ নাই। ম্লান চোখ-দুটি যেন ব্যথায় ও করুণায় ভরা। একটু লক্ষ্য করিলে মনে হয়, যেন ঐ দুটি সজল আবরণের নীচে রোদনের সমুদ্র চাপা দেওয়া আছে—মুক্তি পাইলে বিশ্ব-সংসার ভাসাইয়া দিতে পারে। চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরের দ্বার দিয়া রমা প্রতিমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র শুভানুধ্যায়ীর দল একেবারে তারস্বরে ছোটলোকের চৌদ্দ-পুরুষের নাম ধরিয়া গালিগালাজ করিতে লাগিল। রমা শুনিয়া নিঃশব্দে একটুখানি হাসিল। বোঁটা হইতে টানিয়া ছিঁড়িলে মানুষের হাতের মধ্যে ফুল যেমন করিয়া হাসে ঠিক তেমনি। তাহাতে রাগ-দ্বেষ, আশা-নিরাশা, ভাল-মন্দ কিছুই প্রকাশ পাইল না। সে হাসি সার্থক কি নিরর্থক তাহাই বা কে জানে!

বেণী রাগিয়া কহিল, না না, এ হাসির কথা নয়, এ বড় সর্বনেশে কথা। একবার যখন জানব এর মূলে কে,—বলিয়া দুই হাতের নখ এক করিয়া কহিল, তখন এই এমনি করে ছিঁড়ে ফেলব।

রমা মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। বেণী কহিতে লাগিল, হারামজাদা ব্যাটারা এ বুঝিস নে যে, যার জোরে তোরা জোর করিস্ সেই রমেশ নিজে যে জেলে ঘানি টানচে! তোদের মারতে কতটুকু সময় লাগে?

রমা কোন কথা কহিল না। যে কাজের জন্য আসিয়াছিল তাহা শেষ করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

দেড়-মাস হইল রমেশ অবৈধ প্রবেশ করিয়া, ভৈরবকে ছুরি মারার অপরাধে জেল খাটিতেছে। মোকদ্দমায় বাদীর পক্ষে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় নাই—নূতন ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব কি করিয়া পূর্বাহ্নেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন, এ প্রকার অপরাধ আসামীর পক্ষে খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক। এমন কি, সে ডাকাতি প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট কি না সে বিষয়েও তাঁহার যথেষ্ট সংশয় আছে। থানার কেতাব হইতেও তিনি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে, ঠিক এই ধরনের অপরাধ সে পূর্বেও করিয়াছে এবং আরও অনেকপ্রকার সন্দেহজনক ব্যাপার তাহার নামের সহিত জড়িত আছে। ভবিষ্যতে পুলিশ যেন তাহার

প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে, তিনি এ মন্তব্য প্রকাশ করিতেও ছাড়েন নাই। বেশি সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন হয় নাই, তবে রমাকে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। সে কহিয়াছিল, রমেশ বাড়ি ঢুকিয়া আচার্য মহাশয়কে মারিতে আসিয়াছিল, তাহা সে জানে। কিন্তু ছুরি মারিয়াছিল কি না জানে না, হাতে তাহার ছুরি ছিল কি না, তাহাও স্মরণ হয় না।

কিন্তু এই কি সত্য ? জেলার বিচারালয়ে হলফ করিয়া রমা এই সত্য বলিয়া আসিল ; কিন্তু যে বিচারালয়ে হলফ করার প্রথা নাই, সেখানে সে কি জবাব দিবে ! তাহার অপেক্ষা কে অধিক নিঃসংশয়ে জানিত, রমেশ ছুরিও মারে নাই, হাতে তাহার অস্ত্র থাকা ত দূরের কথা, একটা তৃণ পর্যন্ত ছিল না। সে আদালতে ও-কথা ত কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করিবে না—সে কি স্মরণ করিতে পারে এবং কি পারে না ! কিন্তু এখানকার আদালতে সত্য বলিবার যে তাহার এতটুকু পথ ছিল না ! বেণী প্রভৃতির হাত-ধরা পল্লী-সমাজ সত্য চাহে নাই। সুতরাং সত্যের মূল্যে তাহাকে যে মিথ্যা অপবাদের গাঢ় কালি নিজের মুখময় মাখিয়া এই সমাজের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে—এমন ত অনেকেরই হইয়াছে—এ কথা সে যে নিঃসংশয়ে জানিত। তা ছাড়া এতবড় গুরুদণ্ডের কথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। বড় জোর দু শ'-এক শ' জরিমানা হইবে ইহাই জানিত। বরঞ্চ বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও রমেশ যখন তাহার কাজ ছাড়িয়া কোনমতেই পলাইতে স্বীকার করে নাই, তখন রাগ করিয়া রমা মনে মনে এ কামনাও করিয়াছিল, হোক জরিমানা। একবার শিক্ষা হইয়া যাক্। কিন্তু সে শিক্ষা যে এমন করিয়া হইবে, রমেশের রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখের প্রতি চাহিয়াও বিচারকের দয়া হইবে না—একেবারে ছয় মাস সশ্রম কারাবাসের হুকুম করিয়া দিবে—তাহা সে ভাবে নাই। সেই সময়ে রমা নিজে রমেশের দিকে চাহিয়া দেখিতে পারে নাই। পরের মুখে শুনিয়াছিল, রমেশ একদৃষ্টে তাহারই মুখের পানে চাহিয়াছিল এবং কিছুতেই তাহাকে জেরা করিতে দেয় নাই এবং জেলের হুকুম হইয়া গেলে গোপাল সরকারের প্রার্থনার উত্তরে মাথা নাড়িয়া কহিয়াছিল, না। ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে সারাজীবন কারারুদ্ধ করার হুকুম দিলেও আমি আপিল করে খালাস পেতে চাইনে। বোধ করি, জেল এর চেয়ে ভাল !

ভালই ত তাহাদের চিরানুগত ভৈরব আচার্য মিথ্যা নালিশ করিয়া যখন তাহার ঋণ শোধ করিল এবং রমা সাক্ষ্য-মঞ্চে দাঁড়াইয়া স্মরণ করিতে পারিল না তাহার হাতে ছুরি ছিল কি না, তখন আপিল করিয়া মুক্তি চাহিবে সে কিসের জন্য ! তাহার সেই দুর্জয় অভিমান বিরাট পাষাণখণ্ডের মত রমার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে কোথাও তাহাকে সে নড়াইয়া রাখিবার স্থান পাইতেছে না। সে কি গুরুভার। সে মিথ্যা বলিয়া আসে নাই, এ কৈফিয়ত

তাহার অন্তর্যামী ত কোনমতেই মঞ্জুর করিল না! মিথ্যা বলে নাই বটে, কিন্তু সত্য প্রকাশও করে নাই। সত্য-গোপনের অপরাধ যে এত বড়, সে যে এমন করিয়া তাহাকে অহরহ দগ্ধ করিয়া ফেলিবে, এ যদি সে একবারও জানিতে পারিত! রহিয়া রহিয়া তাহার কেবলই মনে পড়ে ভৈরবের যে অপরাধে রমেশ আত্মহারা হইয়াছিল, সে অপরাধ কত বড়! অথচ তাহার একটিমাত্র কথায় সে সমস্ত মার্জনা করিয়া, দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার ইচ্ছাকে এমন করিয়া শিরোধার্য করিয়া কে কবে তাহাকে এত সম্মানিত করিয়াছিল! নিজের মধ্যে পুড়িয়া পুড়িয়া আজকাল একটা সত্যের সে যেন দেখা পাইতেছিল। যে সমাজের ভয়ে সে এতবড় গর্হিত কর্ম করিয়া বসিল, সে সমাজ কোথায়? বেণী প্রভৃতি কয়েকজন সমাজপতির স্বার্থ ও হিংসার বাহিরে কোথাও কি তাহার অস্তিত্ব আছে? গোবিন্দের এক বিধবা ভ্রাতৃবধূর কথা কে না জানে? বেণীর সহিত তাহার সংস্রবের কথা গ্রামের মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই। অথচ সমাজের আশ্রয়ে সে নিষ্কণ্টকে বসিয়া আছে এবং সেই বেণীই সমাজপতি। তাহারই সামাজিক শৃঙ্খল সর্বাঙ্গে শতপাকে জড়াইয়া রাখাই চরম সার্থকতা! ইহাই হিন্দুয়ানী! কিন্তু যে ভৈরব এত অনর্থের মূল, রমা নিজের দিকে চাহিয়া তাহার উপরেও আর রাগ করিতে পারিল না। মেয়ে তাহার বারো বছরের হইয়াছে—অতি শীঘ্র বিবাহ দিতে না পারিলে একঘরে হইতে হইবে এবং বাড়ি-সুদ্ধ লোকের জাত যাইবে। এ প্রমাদের আশঙ্কামাত্রেই ত প্রত্যেক হিন্দুর হাত পা পেটের ভিতরে ঢুকিয়া যায়। সে নিজে তাহার এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যে সমাজের ভয় কাটাইতে পারে নাই—গরীব ভৈরব কাটাইবে কি করিয়া! বেণীর বিরুদ্ধতা করা তাহার পক্ষে কি ভয়ানক মারাত্মক ব্যাপার, এ কথা ত কোনমতেই সে অস্বীকার করিতে পারে না।

বৃদ্ধ সনাতন হাজরা বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, গোবিন্দ দেখিতে পাইয়া ডাকাডাকি, অনুনয়-বিনয়, শেষকালে একরকম জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বেণীবাবুর সামনে হাজির করিয়া দিল। বেণী গরম হইয়া কহিল, এত দেমাক কবে থেকে হ'ল রে সনাতন? বলি, তোদের ঘাড়ে কি আজকাল আর একটা করে মাথা গজিয়েচে রে!

সনাতন কহিল, দুটো করে মাথা আর কার থাকে বড়বাবু? আপনাদের থাকে না, ত আমাদের মত গরীবের!

কি বললি রে! বলিয়া হাঁক দিয়া বেণী ক্রোধে নির্বাক হইয়া গেল; ইহারই সর্বস্ব যেদিন বেণীর হাতে বাঁধা ছিল, তখনই এই সনাতন দুবেলা আসিয়া বড়বাবুর পদলেহন করিয়া যাইত—আজ তাহারই মুখে এই কথা!

গোবিন্দ রসান দিয়া কহিল, তোদের বুকের পাটা শুধু দেখচি আমরা! মায়ের প্রসাদ পেতেও কেউ তোরা এলিনি, বলি কেন বল্ ত রে?

বুড়ো একটুখানি হাসিয়া কহিল, আর বুকের পাটা! যা করবার সে ত আপনারা আমার করেচেন। সে যাক, কিন্তু মায়ের প্রসাদই বলুন আর যাই বলুন, কোন কৈবর্ত্তই আর বামুনবাড়িতে পাত পাতবে না। এত পাপ যে মা বসুমতী কেমন করে সইচেন, তাই আমরা কেবল বলাবলি করি, বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সনাতন রমার প্রতি চাহিয়া কহিল, একটু সাবধানে থাকো দিদি-ঠাকরুন, পিরপুরের মোচলমান ছোঁড়ারা একেবারে ক্ষেপে রয়েচে। ছোটবাবু ফিরে এলে যে কি কাণ্ড হবে তা ঐ মা দুর্গাই জানেন। এর মধ্যেই দু-তিনবার তারা বড়বাবুর বাড়ির চারপাশে ঘুরে ফিরে গেছে—সামনে পায়নি তাই রক্ষে, বলিয়া সে বেণীর দিকে চাহিল। চক্ষের নিমেষে বেণীর রুক্ষ মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল।

সনাতন কহিতে লাগিল, ঠাকুরের সুমুখে মিথ্যে বলচি নে বড়বাবু, একটু সামলে-সুমলে থাকবেন। রাত-বিরেতে বার হবেন না—কে কোথায় ওত পেতে বসে থাকবে বলা যায় না ত!

বেণী কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না! তাহার মত ভীতু লোক বোধ করি সংসারে ছিল না।

এতক্ষণে রমা কথা কহিল। স্নেহার্দ্র-করুণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, সনাতন, ছোট-বাবুর জন্যেই বুঝি তোমাদের সব এত রাগ?

সনাতন প্রতিমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, মিথ্যে বলে আর নরকে যাব কেন দিদিঠাকরুন, তাই বটে। মোচলমানদের রাগটাই সবচেয়ে বেশি। তারা ছোটবাবুকে হিঁদুদের পয়গম্বর মনে করে। তার সাক্ষী দেখুন আপনারা—জাফর আলি, আঙ্গুল দিয়ে যার জল গলে না, সে ছোটবাবুর জেলের দিন তাদের ইস্কুলের জন্যে একটি হাজার টাকা দান করেচে। শুনি মসজিদে তাঁর নাম করে নাকি নেমাজপড়া পর্য্যন্ত হয়।

রমার শুষ্ক ম্লান মুখখানি অব্যক্ত আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া প্রদীপ্ত নির্নিমেষ চোখে সনাতনের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বেণী অকস্মাৎ সনাতনের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তোকে একবার দারোগার কাছে গিয়ে বলতে হবে সনাতন। তুই যা চাইবি তাই তোকে দেবো, দু বিঘে জমি ছাড়িয়ে নিতে চাস ত তাই পাবি, ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে দিব্যি করচি সনাতন, বামুনের কথাটা রাখ।

সনাতন বিস্মিতের মত কিছুক্ষণ বেণীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল,

আর ক'টা দিন বা বাঁচব বড়বাবু! লোভে পড়ে যদি এই কাজ করি, মরলে আমাকে তোলা চুলোয় যাক, পা দিয়ে কেউ ছোঁবে না! সে দিনকাল আর নেই বড়বাবু, সে দিনকাল আর নেই! ছোটবাবু সব উলটে দিয়ে গেছেন।

গোবিন্দ কহিল, বামুনের কথা তা হলে রাখবি নে বল্‌?

সনাতন মাথা নাড়িয়া বলিল, না। বললে তুমি রাগ করবে গাঙ্গুলীমশাই, কিন্তু সেদিন পিরপুরের নতুন ইস্কুলঘরে ছোটবাবু বলেছিলেন, গলায় গাছ-কতক সুতো ঝোলানো থাকলেই বামুন হয় না। আমি ত আর আজকের নয় ঠাকুর, সব জানি। যা ক'রে তুমি বেড়াও সে কি বামুনের কাজ? তোমাকেই জিজ্ঞাসা করচি দিদিঠাকরুন, তুমিই বল দেখি?

রমা নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিল। সনাতন উৎসাহিত হইয়া মনের আক্রোশ মিটাইয়া বলিতে লাগিল, বিশেষ করে ছোঁড়াদের দল। ছোটবাবুর জেল হওয়া থেকে এই দুটো গাঁয়ের যত ছোকরা সন্ধ্যের পর সবাই গিয়ে জোটে জাফর আলির বাড়িতে। তারা ত চারিদিকে স্পষ্ট বলে বেড়াচ্চে, জমিদার ত ছোটবাবু। আর সব চোর-ডাকাত। তা ছাড়া খাজনা দিয়ে বাস করব—ভয় কারুকে করব না! আর বামুনের মত থাকে ত বামুন, না থাকে আমরাও যা, তারাও তাই।

বেণী আতঙ্কে পরিপূর্ণ হইয়া শুষ্কমুখে প্রশ্ন করিল, সনাতন, আমার ওপরেই তাদের এত রাগ কেন বলতে পারিস্‌?

সনাতন কহিল, রাগ ক'রো না বড়বাবু, কিন্তু আপনি যে সকল নষ্টের গোড়া তা তাদের জানতে বাকী নেই।

বেণী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ছোটলোক সনাতনের মুখে এমন কথাটা শুনিয়াও সে রাগ করিল না, কারণ, রাগ করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না—তাহার বুকের ভিতর ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করিতেছিল।

গোবিন্দ কহিল, তা হলে জাফরের বাড়িতেই আড্ডা বল্‌? সেখানে তারা কি করে বলতে পারিস্‌?

সনাতন তাহার মুখপানে চাহিয়া কি যেন চিন্তা করিল। শেষে কহিল, কি করে জানিনে, কিন্তু ভাল চাও ত সে মতলব ক'রো না ঠাকুর! তারা হিন্দু-মুসলমান ভাই-সম্পর্ক পাতিয়েচে—এক মন, এক প্রাণ। ছোটবাবুর জেল হওয়া থেকে সব রাগে বারুদ হয়ে আছে, তার মধ্যে গিয়ে চক্‌মকি ঠুকে আগুন জ্বালতে যেও না ঠাকুর!

সনাতন চলিয়া গেল, বহুক্ষণ পর্যন্ত কাহারও কথা কহিবার প্রবৃত্তি রহিল না। রমা উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতে বেণী বলিয়া উঠিল, ব্যাপার শুনলে রমা?

রমা মুচকিয়া হাসিল, কথা কহিল না। হাসি দেখিয়া বেণীর গা জ্বলিয়া গেল, কহিল, শালা ভৈরবের জন্যেই এত কাণ্ড। আর তুমি যদি না যাবে সেখানে, না তাকে ছাড়িয়ে দেবে, এ-সব কিছু হ'ত না। তুমি ত হাসবেই রমা, মেয়েমানুষ, বাড়ির বার হতে ত হয় না, কিন্তু আমাদের উপায় কি হবে বল ত? সত্যিই যদি একদিন আমার মাথাটা ফাটিয়ে দেয়? মেয়েমানুষের সঙ্গে কাজ করতে গেলেই এই দশা হয়, বলিয়া বেণী ভয়ে ক্রোধে জ্বালায় মুখখানা কি-একরকম করিয়া বসিয়া রহিল।

রমা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। বেণীকে সে ভালমতেই চিনিত, কিন্তু এতবড় নির্লজ্জ অভিযোগ সে তাহার কাছেও প্রত্যাশা করিতে পারিত না। কোন উত্তর না দিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল। বেণী তখন হাঁক-ডাক করিয়া গোটা-দুই আলো এবং পাঁচ-ছয়জন লোক সঙ্গে করিয়া আশেপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া ত্রস্ত ভীতপদে প্রস্থান করিল।

॥ সতর ॥

বিশ্বেশ্বরী ঘরে ঢুকিয়া অশ্রুভরা রোদনের কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, আজ কেমন আছিস মা রমা?

রমা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আজ ভাল আছি জ্যাঠাইমা!

বিশ্বেশ্বরী তার শিয়রে আসিয়া বসিলেন এবং মাথায় মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আজ তিনমাসকাল রমা শয্যাগত। বুক জুড়িয়া কাসি এবং ম্যালেরিয়ার বিষে সর্বাঙ্গ সমাচ্ছন্ন। গ্রামের প্রাচীন কবিরাজ প্রাণপণে ইহার বৃথা চিকিৎসা করিয়া মরিতেছে। সে বুড়া ত জানে না কিসের অবিশ্রাম আক্রমণে তাহার সমস্ত স্নায়ুশিরা অহর্নিশ পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছে। শুধু বিশ্বেশ্বরীর মনের মধ্যে একটা সংশয়ের ছায়া ধীরে ধীরে গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। রমাকে তিনি কন্যার মতই স্নেহ করিতেন, সেখানে কোন ফাঁকি ছিল না; তাই সে অত্যন্ত স্নেহই রমার সম্বন্ধে তাঁহার সত্যদৃষ্টিকে অসামান্য-

রূপে তীক্ষ্ণ করিয়া দিতেছিল। অপরে যখন ভুল বুঝিয়া, ভুল আশা করিয়া ভুল ব্যবস্থা করিতে লাগিল, তাঁহার তখন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি দেখিতেছিলেন, রমার চোখ-দুটি গভীর কোটরপ্রবিষ্ট, কিন্তু দৃষ্টি অতিশয় তীব্র। যেন বহুদূরের কিছু একটা অত্যন্ত কাছে করিয়া দেখিবার একাগ্র বাসনায় এরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে ডাকিলেন, রমা?

কেন জ্যাঠাইমা?

আমি ত তোর মায়েব মত রমা—

রমা বাধা দিয়া বলিল, মত কেন জ্যাঠাইমা, তুমি ত আমার মা।

বিশ্বেশ্বরী হেঁট হইয়া রমার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, তবে সত্যি করে বল দেখি মা, তোর কি হয়েছে?

অসুখ করেছে জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী লক্ষ্য করিলেন, তাহার এমন পাণ্ডুর মুখখানি যেন পলকের জন্য রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

তখন গভীর স্নেহে তাহার রুক্ষ চুলগুলি একবার নাড়িয়া দিয়া কহিলেন, সে ত দুটো চামড়ার চোখেই দেখতে পাই মা! যা এতে ধরা যায় না, তেমন যদি কিছু থাকে এ সময় মায়ের কাছে লুকোস নে রমা! লুকোলে ত অসুখ সারবে না মা?

জানালার বাইরে প্রভাত-রৌদ্র তখনও প্রখর হইয়া উঠে নাই এবং মৃদুমন্দ বাতাসে শীতের আভাস দিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া রমা চুপ করিয়া রহিল। খানিক পবে কহিল, বড়দা কেমন আছেন জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, ভাল আছে। মাথার ঘা সারাতে এখনও বিলম্ব হয়ে বটে, কিন্তু পাঁচ-ছ'দিনের মধ্যে হাসপাতাল থেকে বাড়ি আসতে পারবে।

রমাব মুখে বেদনার চিহ্ন অনুভব করিয়া বলিলেন, দুঃখ ক'রো না মা, এই তার প্রযোজন ছিল। এতে তাব ভালই হবে, বলিয়া তিনি রমার মুখে বিস্ময়ের আভাস অনুভব করিয়া কহিলেন, ভাবচ, মা হয়ে সন্তানের এত বড় দুর্ঘটনায় এমন কথা কি করে বলচি। কিন্তু তোমাকে সত্যি বলচি মা, এতে আমি ব্যথা বেশি পেযেচ মা, এতে আমি ব্যথা বেশি পেয়েচি, কি আনন্দ বেশি পেয়েচি তা আমি বলতে পারিনে। কেননা, আমি জানি যারা অধর্মকে ভয় করে না, লজ্জার ভয় যাদের নেই, প্রাণের ভয়টা যদি না তাদের তেমনি বেশি থাকে, তা হলে

সংসার ছারখার হয়ে যায়। তাই কেবলই মনে হয় রমা, এই কলুর ছেলে রেণীর যে মঙ্গল করে দিয়ে গেল, পৃথিবীতে কোন আত্মীয়-বন্ধুই ওব সে ভাল করতে পারত না। কয়লাকে ধুয়ে তার রঙ বদলানো যায় না মা, তাকে আগুনে পোড়াতে হয়।

রমা জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িতে তখন কি কেউ ছিল না ?

বিশেশ্বরী কহিলেন, থাকবে না কেন, সবাই ছিল। কিন্তু সে ত খামকা মেবে বসেনি, নিজে জেলে যাবে ব'লে ঠিক করে তবে তেল বেচতে এসেছিল। নিজের রাগ একটুও ছিল না মা, তাই তার বাঁকের একঘায়েই বেণী যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—আর আঘাত করলে না। তা ছাড়া সে বলে গেছে এর পরেও বেণী সাবধান না হলে সে নিজে আর কখনো ফিরুক, না ফিরুক, এই মারই তার শেষ মার নয।

রমা আস্তে আস্তে বলিল, তার মানে আরও লোক পিছনে আসে, কিন্তু আমাদেরদেশে ছোটলোকদেব এত সাহস ত কোনদিন ছিল না জ্যাঠাইমা, কোথা থেকে এ তারা পেলে ?

বিশেশ্বরী মৃদু হাসিযা কহিলেন, সে কি তুই নিজে জানিস নে মা, কে দেশের এই ছোটলোকদের বুক এমন করে ভবে দিয়ে গেছে ? আগুন জ্বলে উঠে শুধু শুধু নেবে না রমা! তাকে জোর করে নেবালেও সে আশেপাশের জিনিস তাতিয়ে দিযে যায়। সে আমার ফিরে এসে দীর্ঘজীবী হয়ে যেখানে খুশি সেখানে থাক, বেণীর কথা মনে করে আমি কোনদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলব না। কিন্তু বলা সত্ত্বেও বিশেশ্বরী যে জোর করিয়াই একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিলেন, তাহা রমা টের পাইল। তাই তাঁহার হাতখানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া স্থির হইয়া রহিল। একটুখানি সামলাইয়া লইয়া বিশেশ্বরী পুনশ্চ কহিলেন, রমা, এক সন্তান যে কি, সে শুধু মায়েই জানে। বেণীকে যখন তারা অচৈতন্য অবস্থায় ধরাধরি করে পালকিতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেল, তখন যে আমার কি হয়েছিল, সে তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। কিন্তু তবুও আমি কারুকে একটা অভিসম্পাত বা কোন লোককে আমি দোষ দিতে পর্যন্ত পারিনি। এ কথা ত ভুলতে পারিনি মা যে এক সন্তান বলে ধর্মের শাসন ত মায়ের মুখ চেয়ে চুপ করে থাকবে না।

রমা একটুখানি ভাবিয়া কহিল, তোমার সঙ্গে তর্ক করচিনে জ্যাঠাইমা, কিন্তু

এই যদি হয়, তবে রমেশদা কোন্ পাপে এ দুঃখ ভোগ করচেন ? আমরা যা করে তাঁকে জেলে পুরে দিয়ে এসেচি, সে ত কারো কাছেই চাপা নেই।

জ্যাঠাইমা বলিলেন, না মা, তা নেই। নেই বলেই বেণী আজ হাসপাতালে। আর তোমার—, বলিয়া তিনি সহসা থামিয়া গেলেন। যে কথা তাঁহার জিহ্বাগ্রে আসিয়া পড়িল, তাহা জোর করিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, কি জানিস মা, কোন কাজই কোনদিন শুধু শুধু শূন্যে মিলিয়ে যায় না। তার শক্তি কোথাও না কোথাও গিয়ে কাজ করেই। কিন্তু কি ক'রে করে, তা সকল সময়ে ধরা পড়ে না বলেই আজ পর্যন্ত এ সমস্যার মীমাংসা হতে পারল না, কেন এক-জনের পাপে আর একজন প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু করতে যে হয় রমা, তাতে ত লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

রমা নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া নীরবে নিঃশ্বাস ফেলিল। বিশ্বেশ্বরী বলিতে লাগিলেন, এর থেকে আমারও চোখ ফুটেছে রমা, ভাল করব বললেই ভাল করা যায় না। গোড়ার অনেকগুলো ছোটবড় সিঁড়ি উত্তীর্ণ হবার ধৈর্য থাকা চাই। একদিন রমেশ হতাশ হয়ে আমাকে বলতে এসেছিল, জ্যাঠাইমা, আমার কাজ নেই এদের ভাল করে, আমি যেখান থেকে চলে এসেছি সেইখানেই চলে যাই। তখন আমি বাধা দিয়ে বলেছিলাম, না রমেশ, কাজ যদি শুরু করেছিস বাবা, তবে ছেড়ে দিয়ে পালাস নে। আমার কথা সে ত কখনও ঠেলতে পারে না ; তাই যেদিন তার জেলের হুকুম শুনতে পেলাম, সেদিন মনে হ'ল ঠিক যেন আমিই তাকে ধরে-বেঁধে এই শাস্তি দিলাম। কিন্তু তার পরে বেণীকে যেদিন হাসপাতালে নিয়ে গেল, সেদি প্রথম টের পেলাম—না না, তারও জেল খাটবার প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া ত জানিনি মা, বাইরে থেকে ছুটে এসে ভাল করতে যাওয়ার বিড়ম্বনা এত—সে কাজ এমন কঠিন! আগে যে মিলতে হয় সকলের সঙ্গে, ভালতে-মন্দতে এক না হতে পারলে যে কিছুতেই ভাল করা যায় না—সে কথা ত মনে ভাবিনি। প্রথম থেকেই সে তার শিক্ষা, সংস্কার, মস্ত জোর, মস্ত প্রাণ নিয়ে এতই উঁচুতে দাঁড়াল যে, শেষ পর্যন্ত কেউ তার নাগালই পেলে না। কিন্তু সে ত আমার চোখে পড়ল না মা, আমি তাকে যেতেও দিলাম না, রাখতেও পারলাম না।

রমা কি একটা বলিতে গিয়া চাপিয়া গেল। বিশ্বেশ্বরী তাহা অনুমান করিয়া কহিলেন, না রমা, অনুতাপ আমি সেজন্য করিনে। কিন্তু তুইও শুনে রাগ করিস নে মা, এইবার তাকে তোরা নাবিয়ে এনে সকলের সঙ্গে যে মিলিয়ে

দিলি, তাতে তোদের অধর্ম যত বড়ই হোক, সে কিন্তু ফিরে এসে এবার যে ঠিক সত্যটির দেখা পাবে, এ কথা আমি বড়-গলা করেই বলে যাচ্ছি।

রমা কথাটা বুঝিতে না পারিয়া কহিল, কিন্তু এতে তিনি কেন নেবে যাবেন জ্যাঠাইমা? আমাদের অন্যায় অধর্মের ফলে যত বড় যাতনাই তাঁকে ভোগ করতে হোক, আমাদের দুষ্কৃতি আমাদেরই নরকের অন্ধকূপে ঠেলে দেবে, তাঁকে স্পর্শ করবে কেন?

বিশ্বেশ্বরী ম্লানভাবে একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, করবে বৈ কি মা। নইলে পাপ আর এত ভয়ঙ্কর কেন? উপকারের প্রত্যুপকার কেউ যদি নাই করে, এমন কি উলটে অপকারই করে, তাতেই বা কি এসে যায় মা, যদি না তার কৃতঘ্নতায় দাতাকে নাবিয়ে আনে! তুই বলচিস মা, কিন্তু তোদের কুঁয়াপুর রমেশকে কি আর তেমনটি পাবে? সে ফিরে এলে তোরা স্পষ্ট দেখতে পাবি, সে যে হাত দিয়ে দান করে বেড়াত, ভৈরব তা'র সেই ডান হাতটাই মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েচে।

আরপর একটু থামিয়া নিজেই বলিলেন, কিন্তু কে জানে! হয়ত ভালই হয়েচে। তার বলিষ্ঠ সমগ্র হাতের অপর্যাপ্ত দান গ্রহণ করবার শক্তি যখন গ্রামের লোকের ছিল না, তখন এই ভাঙ্গা হাতটাই বোধ করি এবার তাদের সত্যিকার কাজে লাগবে, বলিয়া তিনি গভীর একটা নিঃশ্বাস মোচন করিলেন।

তাঁহার হাতখানি রমা নীরবে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া ধীরে ধীরে বড় করুণকণ্ঠে কহিল, আচ্ছা জ্যাঠাইমা, মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে নিরপরাধীকে দণ্ডভোগ করানর শাস্তি কি?

বিশ্বেশ্বরী জানালার বাহিরে চাহিয়া রমার বিপর্যস্ত রুক্ষ চুলের রাশির মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন, তাহার নিমীলিত দুই চোখের প্রান্ত বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। সস্নেহে মুছাইয়া কহিলেন, কিন্তু তোমার ত হাত ছিল না মা। মেয়েমানুষের এতবড় কলঙ্কের ভয় দেখিয়ে যে কাপুরুষেরা তোমার ওপর এই অত্যাচার করেচে, সমস্ত গুরুদণ্ডই তাদের। তোমাকে ত এর একটি কিছুই বইতে হবে না মা! বলিয়া তিনি তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। তাঁহার একটিমাত্র আশ্বাসেই রমার রুদ্ধ অশ্রু এইবার প্রস্রবণের ন্যায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে কহিল, কিন্তু তাঁরা যে তাঁর শত্রু। তাঁরা বলেন, শত্রুকে যেমন করে হোক নিপাত করতে দোষ নেই। কিন্তু আমার ত সে কৈফিয়ত নেই জ্যাঠাইমা।

তোমারই বা কেন নেই মা? প্রশ্ন করিয়া তিনি দৃষ্টি আনত করিতেই অকস্মাৎ তাঁহার চোখের উপর যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে সংশয় মুখ ঢাকিয়া একদিন তাঁর মনের মধ্যে অকারণে আনাগোনা করিয়া বেড়াইত, সে

যেন তাহার মুখোশ ফেলিয়া দিয়া একেবারে সোজা হইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইল। আজ তাহাকে চিনিতে পারিয়া ক্ষণকালের জন্য বিশ্বেশ্বরী বেদনায় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। রমার হৃদয়ের ব্যথা আর তাঁহার অগোচর রহিল না।

রমা চোখ বুজিয়া ছিল, বিশ্বেশ্বরীর মুখের ভাব দেখিতে পাইল না। ডাকিল, জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা চকিত হইয়া তাহার মাথাটা একটুখানি নাড়িয়া দিয়া সাড়া দিলেন।

রমা কহিল, একটা কথা আজ তোমার কাছে স্বীকার করব জ্যাঠাইমা। পিরপুরের জাফর আলির বাড়িতে সন্ধ্যার পর গ্রামের ছেলেরা জড় হয়ে রমেশদার কথামত সৎ আলোচনাই করত, বদমাইসের দল বলে তাদের পুলিশে ধরিয়ে দেবার একটা মতলব চলছিল—আমি লোক পাঠিয়ে তাদের সাবধান করে দিয়েছি। কারণ পুলিশ ত এই চায়। একবার তাদের হাতে পেলে ত আর রক্ষা রাখত না।

শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী শিহরিয়া উঠিলেন—বলিস কিরে? নিজের গ্রামের মধ্যে পুলিশের এই উৎপাত বেণী মিছে করে ডেকে আনতে চেয়েছিল?

রমা কহিল, আমার মনে হয় বড়দার এই শাস্তি তারই ফল। আমাকে মাপ করতে পারবে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী হেঁট হইয়া নীরবে রমার ললাট চুম্বন করিলেন। বলিলেন, তার মা হয়ে এ যদি না আমি মাপ করতে পারি, কে পারবে রমা? আমি আশীর্বাদ করি, এর পুরস্কার ভগবান তোমাকে যেন দেন।

রমা হাত দিয়ে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, আমার এই একটা সান্ত্বনা জ্যাঠাইমা, তিনি ফিরে এসে দেখবেন তাঁর সুখের ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'য়ে আছে। যা তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর সেই দেশের চাষাভূষারা এবার ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেচে —তাঁকে চিনেছে, তাঁকে ভালবেসেছে। এই ভালবাসার আনন্দে তিনি আমার অপরাধ কি ভুলতে পারবেন না জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী কথা বলিতে পারিলেন না। শুধু তাঁহার চোখ হইতে এক-ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া রমার কপালের উপর পড়িল। তারপর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

রমা ডাকিল, জ্যাঠাইমা!

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, কেন মা?

রমা কহিল, শুধু একটা জায়গায় আমরা দূরে যেতে পারিনি। তোমাকে আমরা দুজনেই ভালবেসেছিলাম।

বিশ্বেশ্বরী আবার নত হইয়া তাহার ললাট চুম্বন করিলেন।

রমা কহিল, সেই জোরে আমি একটা দাবি তোমার কাছে রেখে যাব। আমি যখন আর থাকব না, তখনও আমাকে যদি তিনি ক্ষমা করতে না পারেন, শুধু এই কথাটি আমার হয়ে তাঁকে বলো জ্যাঠাইমা, যত মন্দ বলে আমাকে তিনি

জানতেন তত মন্দ আমি ছিলাম না। আর যত দুঃখ তাঁকে দিয়েছি, তার অনেক বেশি দুঃখ যে আমিও পেয়েচি তোমার মুখের এই কথাটি হয়ত তিনি অবিশ্বাস করবেন না।

বিশ্বেশ্বরী উপুড় হইয়া পড়িয়া বুক দিয়া রমাকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, চল মা আমরা কোন তীর্থে গিয়ে থাকি। যেখানে বেণী নেই, রমেশ নেই—যেখানে চোখ তুললেই ভগবানের মন্দিরের চূড়া চোখে পড়ে—সেখানেই যাই। আমি সব বুঝতে পেরেচি রমা। যদি যাবার দিন তোর এগিয়ে এসে থাকে মা, তবে এ বিষ বুকে পুরে জ্বলেপুড়ে সেখানে গেলে ত চলবে না। আমরা বামুনের মেয়ে, সেখানে যাবার দিনটিতে আমাদের তার মতই গিয়ে উপস্থিত হতে হবে।

রমা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস আয়ত্ত করিতে করিতে শুধু কহিল, আমিও তেমনি ক'রেই যেতে চাই জ্যাঠাইমা।

॥ আঠার ॥

কারা-প্রাচীরের যে তাহার সমস্ত দুঃখ ভগবান এমন করিয়া সার্থক করিয়া দিবার আয়োজন করিয়া রাখিযাছিলেন, বোধ করি উন্মত্ত বিকারেও ইহা রমেশের আশা করা সম্ভবপর ছিল না। ছয় মাস সশ্রম কারাবাসের পর মুক্তি-লাভ করিয়া সে জেলের বাহিরে পা দিয়াই দেখিল অচিন্তনীয় ব্যাপার। স্বয়ং বেণী ঘোষাল মাথায় চাদর জড়াইয়া সর্বাগ্রে দণ্ডায়মান। তাঁহার পশ্চাতে উভয়-বিদ্যালয়ের মাস্টার পণ্ডিত ও ছাত্রের দল, কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান প্রজা। বেণী সজোরে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদ কাঁদ গলায় কহিল, রমেশ ভাই রে, নাড়ীর টান যে এমন টান, এবার তা টের পেয়েছি। যদু মুখুয্যের মেযে যে আচায্যি হারামজাদাকে হাত করে এমন শত্রুতা করবে, লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে নিজে এসে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এত দুঃখ দেবে, সে কথা জেনেও যে আমি তখন জানতে চাইনি, ভগবান তার শাস্তি আমাকে ভালমতোই দিয়েছেন। জেলের মধ্যে তুই বরং ছিলি ভাল রমেশ, বাইরে এই ছটা মাস আমি যে তুষের আগুনে জ্বলে-পুড়ে গেছি।

রমেশ কি করিবে কি বলিবে ভাবিযা না পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। হেডমাস্টার পাড়ুইমহাশয় একেবারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া রমেশের পায়ের ধূলা মাথায় লইলেন। তাঁহার পিছনের দলটি তখন অগ্রসর হইয়া কেহ আশীর্বাদ, কেহ সেলাম, কেহ প্রণাম করিবার ঘটায় সমস্ত পথটা যেন চষিয়া ফেলিতে লাগিল। বেণীর কান্না আর বাধ মানিল না। অশ্রুগদগদকণ্ঠে কহিল, দাদার ওপর অভিমান রাখিস নে ভাই, বাড়ি চল্। মা কেঁদে কেঁদে দু'চক্ষু অন্ধ করবার যোগাড় করেচেন।

ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল; রমেশ বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাতে চড়িয়া বসিল। বেণী সম্মুখের আসনে স্থান গ্রহণ করিয়া মাথার চাদর খুলিয়া

ফেলিলেন। ঘা শুকাইয়া গেলেও আঘাতের চিহ্ন জাজ্বল্যমান। বেণী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডান হাত উলটাইয়া কহিলেন, কাকে আর দোষ দেব ভাই, আমার নিজের কর্মফল—আমারই পাপের শাস্তি! কিন্তু সে আর শুনে কি হবে? বলিয়া মুখের উপর গভীর বেদনার আভাস ফুটাইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার নিজের মুখের এই সরল স্বীকারোক্তিতে রমেশের চিত্ত আর্দ্র হইয়া গেল। সে মনে করিল, কিছু একটা হইয়াছেই। তাই সে কথা শুনিবার জন্য আর পীড়াপীড়ি করিল না। কিন্তু বেণী যেজন্য এই ভূমিকাটি করিল, তাহা ফাঁসিয়া যাইতেছে দেখিয়া সে নিজেই মনে মনে ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিল। মিনিট-দুই নিঃশব্দে কাটার পরে, সে আবার একটা নিঃশ্বাসের দ্বারা রমেশের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমার এই একটা জন্মগত দোষ যে কিছুতেই মনে এক মুখে আর এক করতে পারিনে। মনের ভাব আর পাঁচজনের মত ঢেকে রাখতে পারিনে বলে কত শাস্তিই যে ভোগ করতে হয়, কিন্তু তবু ত আমার চৈতন্য হ'ল না।

রমেশ চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া বেণী কণ্ঠস্বর আরও মৃদু ও গম্ভীর করিয়া কহিতে লাগিল, আমার দোষের মধ্যে সেদিন মনের কষ্ট আর চাপতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে বলে ফেলেছিলাম, রমা, আমরা তোর এমন কি অপরাধ করেছিলাম যে, এই সর্বনাশ আমাদের করলি! জেল হয়েছে শুনলে যে মা একেবারে প্রাণ-বিসর্জন করবেন! আমরা ভায়ে ভায়ে বিষয় নিয়ে ঝগড়া করি —যা করি, কিন্তু তবু ত সে আমার ভাই! তুই একটি আঘাতে আমার ভাইকে মারলি, মাকে মারলি! কিন্তু নির্দোষীর ভগবান আছেন। বলিয়া সে গাড়ির বাইরে আকাশের পানে চাহিয়া আর একবার যেন নালিশ জানাইল।

রমেশ যদিও এ অভিযোগে যোগ দিল না, কিন্তু মন দিয়া শুনিতে লাগিল। বেণী একটু থামিয়া কহিল, রমেশ, সে উগ্রমূর্তি মনে হলে এখনো হৃৎকম্প হয়, দাঁতে দাঁত ঘষে বললে, রমেশের বাপ আমার বাপকে জেলে দিতে যায়নি? পারলে ছেড়ে দিত বুঝি? মেয়েমানুষের এত দর্প সহ্য হ'ল না রমেশের! আমিও রেগে বলে ফেললাম, আচ্ছা ফিরে আসুক সে, তার পরে এর বিচার হবে!

এতক্ষণ পর্যন্ত রমেশ বেণীর কথাগুলো মনের মধ্যে ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। কবে তাহার পিতা রমার পিতাকে জেলে দিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা সে জানে না। কিন্তু ঠিক এই কথাটিই সে দেশে পা দিয়াই রমার মাসির মুখে শুনিয়াছিল, তাহার মনে পড়িল। তখন পরের ঘটনা শুনিবার জন্য সে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল।

বেণী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, খুন করা তার অভ্যাস আছে ত। আকবর লেঠেলকে পাঠিয়েছিল মনে নেই? কিন্তু তোমার কাছে ত চালাকি খাটেনি, বরঞ্চ তুমিই উলটে শিখিয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু আমাকে দেখচ ত? এই ক্ষীণজীবী—বলিয়া বেণী একটু চিন্তা করিয়া লইয়া তুচ্ছ কলুর ছেলের কল্পিত বিবরণ নিজের অন্ধকার অন্তরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া আপনার ভাষায় ধীরে

ধীরে গ্রথিত করিয়া বিবৃত করিল।

রমেশ রুদ্ধনিশ্বাসে কহিল, তার পর ?

বেণী মলিনমুখে একটুখানি হাসিয়া কহিল, তার পরে কি আর মনে আছে ভাই! কে কিসে ক'রে যে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে কি হ'ল, কে দেখলে, কিছুই জানিনে। দশ দিন পরে জ্ঞান হয়ে দেখলাম হাসপাতালে পড়ে আছি। এ-যাত্রা যে রক্ষে পেয়েচি সে কেবল মায়ের পুণ্যে—এমন মা কি আর আছে রমেশ!

রমেশ একটি কথাও কহিতে পারিল না, কাঠের মূর্তি'র মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। শুধু কেবল তাহার দশ অঙ্গুলি জড় হইয়া বজ্র-কঠিন মুঠায় পরিণত হইল। তাহার মাথায় ক্রোধ ও ঘৃণার যে ভীষণ বহ্নি জ্বলিতে লাগিল, তাহার পরিমাণ করিবার কাহারও সাধ্য রহিল না। বেণী যে কত মন্দ তাহা সে জানিত। তাহার অসাধ্য যে কিছুই নাই ইহাও তাহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু সংসারে কোন মানুষই যে এত অসত্য এমন অসঙ্কোচে এরূপ অনর্গল উচ্চারণ করিয়া যাইতে পারে, তাহা কল্পনা করিবার মত অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না। তাই রমার সমস্ত অপরাধই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল।

সে দেশে ফিরিয়া আসায় গ্রামময় যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। প্রতিদিন সকালে, দুপুরে এবং রাত্রি পর্যন্ত এত জনসমাগম, এত কথা, এত আত্মীয়তার ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল যে, কারাবাসের যেটুকু গ্লানি তাহার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা উবিয়া গেল। তাহার অবর্তমানে গ্রামের মধ্যে যে খুব বড় একটা সামাজিক স্রোত ফিরিয়া গিয়াছে; তাহাতে কোন সংশয় নাই; কিন্তু এই কয়টা মাসের মধ্যেই এতবড় পরিবর্তন কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা ভাবিতে গিয়া তাহার চোখে পড়িল, বেণীর প্রতিকূলতায় যে শক্তি পদে পদে প্রতিহত হইয়া কাজ করিতে পারিতেছিল না, অথচ সঞ্চিত হইতেছিল, তাহাই এখন তাহার অনুকূলতায় দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। বেণীকে সে আজ আরও একটু ভাল করিয়া চিনিল। এই লোকটাকে এরূপ অনিষ্টকারী জানিয়াও সমস্ত গ্রামের লোক যে তাহার কতদূর বাধ্য, তাহা আজ সে যেমন দেখিতে পাইল এমন কোন দিন নয়। ইহারই বিরোধ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া রমেশ মনে মনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল! শুধু তাই নয় রমেশের উপর অন্যায় অত্যাচারের জন্য গ্রামের সকলেই মর্মাহত, সে কথা একে একে সবাই তাহাকে জানাইয়া গিয়াছে! ইহাদের সমবেত সহানুভূতি লাভ ক'রয়া এবং বেণীকে সপক্ষে পাইয়া, আনন্দ উৎসাহে হৃদয় তাহার বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। ছয় মাস পূর্বে যে-সকল কাজ আরম্ভ করিয়াই তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল, আবার পূর্ণোদ্যমে তাহাতে লাগিয়া পড়িবে সংকল্প করিয়া রমেশ কিছু দিনের জন্য, নিজেও এই সকল আমোদ-আহ্লাদে গা ঢালিয়া দিয়া সর্বত্র ছোট-বড় সকল বাড়িতে সকলের কাছে সকল বিষয়ে খোঁজ-খবর লইয়া সময় কাটাইতে লাগিল। শুধু একটা বিষয় হইতে সে সর্বপ্রযত্নে নিজেকে পৃথক করিয়া রাখিতেছিল—তাহা রমার

প্রসঙ্গ যে পীড়িত তাহা পথে শুনিয়াছিল ; কিন্তু সে পীড়া যে এখন কোথায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কোন সংবাদ গ্রহণ করিতে চাহে নাই। তাহার সমস্ত সম্বন্ধ হইতে আপনাকে সে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে, ইহাই তাহার ধারণা। গ্রামে আসিয়াই মুখে মুখে শুনিয়াছিল, শুধু একা রমাই যে তাহার সমস্ত দুঃখের মূল তাহা সবাই জানে। সুতরাং এইখানে বেণী যে মিথ্যা কথা কহে নাই তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। দিন পাঁচ-ছয় পরে বেণী আসিয়া রমেশকে চাপিয়া ধরিল। পিরপুরের একটা বড় বিষয়ের অংশ-বিভাগ লইয়া বহুদিন হইতে রমার সহিত তাহার প্রচ্ছন্ন মনোবিবাদ ছিল, এই সুযোগে সেটা হস্তগত করিয়া লওয়া তাহার উদ্দেশ্য।

বেণী বাহিরে যাই বলুক, সে মনে মনে রমাকে ভয় করিত। এখন সে শয্যাগত, মামলা-মকদ্দমা করিতে পারিবে না ; উপরন্তু তারাদের মুসলমান প্রজারাও রমেশের কথা ঠেলিতে পারিবে না। পরে যাই হোক, আপাততঃ বে-দখল করিবার এমন অবসর আর মিলিবে না বলিয়া সে একেবারে জিদ ধরিয়া বসিল। রমেশ আশ্চর্য হইয়া অস্বীকার করিতেই বেণী বহু প্রকারের যুক্তি প্রয়োগ করিয়া শেষে কহিল, হবে না কেন? বাগে পেয়ে সে কবে তোমাকে রেয়াৎ করেচে যে, তার অসুখের কথা তুমি ভাবতে যাচ্ছ? তোমাকে যখন সে জেলে দিয়েছিল, তখন তোমার অসুখই বা কোন্ কম ছিল ভাই!

কথাটা সত্য। রমেশ অস্বীকার করিতে পারিল না। তবু কেন যে তাহার মন কিছুতেই তাহার বিপক্ষতা করিতে চাহিল না—বেণীর সহস্র কটু উত্তেজনা সত্ত্বেও রমার অসহায় পীড়িত অবস্থা মনে করিতেই তাহার সমস্ত বিরুদ্ধ-শক্তি সংকুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গেল ; তাহার সুস্পষ্ট হেতু সে নিজেও খুঁজিয়া পাইল না! রমেশ চুপ করিয়া রহিল। বেণী কাজ হইতেছে জানিলে ধৈর্য ধরিতে জানে। সে তখনকার মত আর পীড়াপীড়ি না করিয়া চলিয়া গেল।

এবার আর একটা জিনিস রমেশের বড় দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিশ্বেশ্বরীর কোন দিনই সংসারে যে বিশেষ আসক্তি ছিল না, তাহা সে পূর্বেও জানিত, কিন্তু এবার ফিরিয়া আসিয়া সেই অনাসক্তিটা যেন বিতৃষ্ণায় পরিণত হইয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। কারাগার হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বেণীর সমভিব্যাহারে যেদিন সে-গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, সেদিন বিশ্বেশ্বরী আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সজলকণ্ঠে বারংবার অসংখ্য আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তথাপি কি যেন একটা তাহাতে ছিল, যাহাতে সে ব্যথাই পাইয়াছিল। আজ হঠাৎ কথায় কথায় শুনিল বিশ্বেশ্বরী কাশী-বাস সংকল্প করিয়া যাত্রা করিতেছেন, আর ফিরিবেন না ; শুনিয়া সে চমকিয়া গেল। কৈ সে ত কিছুই জানে না! নানা কাজে পাঁচ-ছ'দিনের মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, কিন্তু যেদিন হইয়াছিল সেদিন ত তিনি কোন কথা বলেন নাই! যদিচ সে জানিত, তিনি নিজে হইতে আপনার বা পরের কথা আলোচনা করিতে কোন দিন ভালবাসেন না, কিন্তু আজিকার সংবাদটার সহিত সেদিনের স্মৃতিটা

পাশাপাশি চোখের সামনে তুলিয়া ধরিবামাত্র তাঁহার এই একান্ত বৈরাগ্যের অর্থ দেখিতে পাইল। আর তাহার লেশমাত্র সংশয় রহিল না, জ্যাঠাইমা সত্যই বিদায় লইতেছেন। এ যে কি, তাঁহার অবিদ্যমানতা যে কি অভাব, মনে করিতেই তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। আর মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া সে এ-বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা তখন নটা-দশটা। ঘরে ঢুকিতে গিয়া দাসী জানাইল তিনি মুখুয্যেবাড়ি গেছেন।

রমেশ আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, এমন সময় যে ?

এ দাসীটি বহুদিনের পুরানো। সে মৃদু হাসিয়া কহিল, মার আবার সময়-অসময়। তা ছাড়া, আজ তাঁদের ছোটবাবুর পৈতে কিনা।

যতীনের উপনয়ন ?

রমেশ আরও আশ্চর্য হইয়া কহিল, কৈ এ কথা ত কেউ জানে না ?

দাসী কহিল, তাঁরা কাউকে বলেন নি। বললেও ত কেউ গিয়ে খাবে না— রমাদিদিকে কর্তারা সব একঘরে করে রেখেছেন কিনা।

রমেশের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই দাসী সলজ্জে ঘাড়টা ফিরাইয়া বলিল, কি জানি ছোটবাবু—রমাদিদির কি সব বিশ্রী অখ্যাতি বেরিয়েচে কিনা—আমরা গরীব-দুঃখী মানুষ, সে সব জানিনে ছোটবাবু—বলিতে বলিতে সে সরিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রমেশ গৃহে ফিরিয়া আসিল। এ যে বেণীর ক্রুদ্ধ প্রতিশোধ তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়াও সে বুঝিল। কিন্তু ক্রোধ কি জন্য এবং কিসের প্রতিহিংসা কামনা করিয়া সে কোন্ বিশেষ কদর্য ধারায় রমার অখ্যাতিকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে, এ-সকল ঠিকমত অনুমান করাও তাহার দ্বারা সম্ভবপর ছিল না।

॥ উনিশ ॥

সেইদিন অপরাহ্নে একটা অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটিল। আদালতের বিচার উপেক্ষা করিয়া কৈলাস নাপিত এবং সেখ মতিলাল সাক্ষীসাবুদ সঙ্গে লইয়া রমেশের শরণাপন্ন হইল। রমেশ অকৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল, আমার বিচার তোমরা মানবে কেন বাপু ?

বাদী-প্রতিবাদী উভয়েই জবাব দিল, মানব না কেন বাবু, হাকিমের চেয়ে আপনার বিদ্যাবুদ্ধিই কোন্ অংশে কম ? আর হাকিম হুজুর যা কিছু তা আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোকেই ত হয়ে থাকেন! কাল যদি আপনি সরকারী চাকরি নিয়ে হাকিম হয়ে বসে বিচার করে দেন, সেই বিচার ত আমাদেরই মাথা পেতে নিতে হবে। তখন ত মানব না বললে চলবে না।

কথা শুনিয়া রমেশের বুক গর্বে আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। কৈলাস কহিল, আপনাকে আমরা দুজনেই দু'কথা বুঝিয়ে বলতে পারব; কিন্তু

আদালতে সেটি হবে না। তা ছাড়া গাঁটের কড়ি মুঠো ভরে উকিলকে না দিতে পারলে সুবিধে কিছুতেই হয় না বাবু। এখানে একটি পয়সা খরচ নেই, উকিলকে খোসামোদ করতে হবে না, পথ হাঁটাহাঁটি করে মরতে হবে না। না বাবু, আপনি যা হুকুম করবেন, ভাল হোক মন্দ হোক, আমরা তাতেই রাজী হয়ে আপনার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরে যাব। ভগবান সুবুদ্ধি দিলেন, আমরা দুজনে তাই আদালত থেকে ফিরে এসে আপনার চরণেই শরণ নিলাম।

একটা ছোট নালা লইয়া উভয়ের বিবাদ। দলিল-পত্র সামান্য যাহা কিছু ছিল রমেশের হাতে দিয়া কাল সকালে আসিবে বলিয়া উভয়ে লোকজন লইয়া প্রস্থান করিবার পর রমেশ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। ইহা তাহার কল্পনার অতীত। সুদূর ভবিষ্যতেও সে কখনো এতবড় আশা মনে ঠাঁই দেয় নাই। তাহার মীমাংসা ইহারা পরে গ্রহণ করুক বা না করুক, কিন্তু আজ যে ইহারা সরকারী আদালতের বাহিরে বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার অভিপ্রায়ে পথ হইতে ফিরিয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই তাহার বুক ভরিয়া আনন্দস্রোত ছুটাইয়া দিল। যদিও বেশি কিছু নয়, সামান্য দুইজন গ্রামবাসীর অতি তুচ্ছ বিবাদের কথা, কিন্তু এই তুচ্ছ কথার সূত্র ধরিয়াই তাহার চিত্তের মাঝে অনন্ত সম্ভাবনার আকাশ-কুসুম ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার এই দুর্ভাগিনী জন্মভূমির জন্য ভবিষ্যতে সে কি না করিতে পারিবে তাহার কোথাও কোনো হিসাব-নিকাশ, কূল-কিনারা রহিল না। বাহিরে বসন্ত জোৎস্নায় আকাশ ভাসিয়া যাইতেছিল, সেদিকে চাহিয়া হঠাৎ তাহার রমাকে মনে পড়িল। অন্য কোন দিন হইলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিয়া উঠিত। কিন্তু আজ জ্বালা করা ত দূরের কথা, কোথাও সে একবিন্দু উত্তাপের অস্তিত্বও অনুভব করিল না। মনে মনে একটু হাসিয়া তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, তোমার হাত দিয়ে ভগবান আমাকে এমন সার্থক করে তুলবেন, তোমার বিষ আমার অদৃষ্টে এমন অমৃত হয়ে উঠবে, এ যদি তুমি জানতে রমা, বোধ করি কখনও আমাকে জেলে দিতে চাইতে না।—কে গা ?

আমি রাধা, ছোটবাবু! রমাদিদি অতি অবিশ্যি করে একবার দেখা দিতে বলেচেন।

রমা সাক্ষাৎ করিবার জন্য দাসী পাঠাইয়া দিয়াছে। রমেশ অবাক হইয়া রহিল। আজ এ কোন্ নষ্টবুদ্ধি-দেবতা তাহার সহিত সকল প্রকারের অনাসৃষ্টি কৌতুক করিতেছেন !

দাসী কহিল, একবার দয়া করে যদি ছোটবাবু—

কোথায় তিনি ?

ঘরে শুয়ে আছেন। একটু থামিয়া কহিল, কাল ত আর সময় হয়ে উঠবে না ; তাই এখন যদি একবার—

আচ্ছা চল যাই, বলিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়া রমা একপ্রকার সচকিত অবস্থায় বিছানায় পড়িয়াছিল। দাসীর নির্দেশমত রমেশ ঘরে ঢুকিয়া একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিতেই সে শুধুমাত্র যেন মনের জোরেই নিজেকে টানিয়া আনিয়া রমেশের পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করিল। ঘরের এককোণে মিট্‌মিট্‌ করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল ; তাহারই মৃদু আলোকে রমেশ অস্পষ্ট আকারে রমার যতটুকু দেখিতে পাইল তাহাতে তাহার শারীরিক অবস্থার কিছু জানিতে পারিল না। এইমাত্র পথে আসিতে আসিতে সে যে রকম সংকল্প মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, রমার সম্মুখে বসিয়া তাহার আগাগোড়াই বেঠিক হইয়া গেল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, এখন কেমন আছ রাণী ?

রমা তাহার পায়ের গোড়া হইতে একটুখানি সরিয়া বসিয়া কহিল, আমাকে আপনি রমা বলেই ডাক্‌বেন।

রমেশের পিঠে কে যেন চাবুকের ঘা মারিল। সে একমুহূর্তেই কঠিন হইয়া কহিল, বেশ, তাই। শুনেছিলাম তুমি অসুস্থ ছিলে—এখন কেমন আছ তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। নইলে নাম যাই হোক, সে ধ'রে ডাকবার আমার ইচ্ছেও নেই, আবশ্যকও হবে না।

রমা সমস্ত বুঝিল। একটুখানি স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, এখন আমি ভাল আছি।

তার পরে কহিল, আমি ডেকে পাঠিয়েছি বলে আপনি হয়ত খুব আশ্চর্য হয়েচেন, কিন্তু—

রমেশ কথার মাঝখানেই তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, না হইনি। তোমার কোন কাজে আশ্চর্য হবার দিন আমার কেটে গেছে। কিন্তু ডেকে পাঠিয়েছ কেন ?

কথাটা রমার বুকে যে কত বড় শেলাঘাত করিল তা রমেশ জানিতে পারিল না। সে মৌন-নতমুখে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল, রমেশদা, আজ দুটি কাজের জন্যে তোমাকে কষ্ট দিয়ে ডেকে এনেচি। আমি তোমার কাছে কত অপরাধ যে করেচি, সে ত আমি জানি। কিন্তু তবু আমি নিশ্চয়ই জানতাম, তুমি আসবে আর আমার এই শেষ অনুরোধও অস্বীকার করবে না।

অশ্রুভারে সহসা তাহার স্বরভঙ্গ হইয়া গেল। তাহা এতই স্পষ্ট যে রমেশ টের পাইল এবং চক্ষের নিমেষে তাহার পূর্বস্নেহ আলোড়িত হইয়া উঠিল। এত আঘাত-প্রতিঘাতেও সে স্নেহ যে আজিও মরে নাই, শুধু নির্জীব অচৈতন্যের মত পড়িয়াছিল মাত্র, তাহা নিশ্চিত অনুভব করিয়া সে নিজেও আজ বিস্মিত হইয়া গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে কহিল, কি তোমার অনুরোধ ?

রমা চকিতের মত মুখ তুলিয়াই আবার অবনত করিল। কহিল, যে বিষয়টা বড়দা তোমার সাহায্যে দখল করতে চাচ্চেন, সেটা আমার নিজের, অর্থাৎ আমার

পোনর আনা, তোমাদের এক আনা ; সেইটাই আমি তোমাকে দিয়ে যেতে চাই।

রমেশ পুনর্বার উষ্ণ হইয়া উঠিল। কহিল, তোমার ভয় নেই আমি চুরি করতে পূর্বেও কখনো কাউকে সাহায্য করিনি, এখনো করব না। আর যদি দান করতেই চাও—তার জন্যে অন্য লোক আছে—আমি দান গ্রহণ করিনে।

পূর্বে হইলে রমা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিত, মুখুয্যেদের দান গ্রহণ করায় ঘোষালদের অপমান হয় না। আজ কিন্তু এ কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সে বিনীতভাবে কহিল, আমি জানি রমেশদা, তুমি চুরি করতে সাহায্য করবে না। আর নিলেও যে তুমি নিজের জন্য নেবে না সে-ও আমি জানি। কিন্তু তা ত নয়। দোষ করলে শাস্তি হয়। আমি যত অপরাধ করেচি, এটা তারই জরিমানা বলে কেন গ্রহণ কর না।

রমেশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তোমার দ্বিতীয় অনুরোধ ?

রমা কহিল, আমার যতীনকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। তাকে তোমার মত করে মানুষ ক'রো। বড় হয়ে সে যেন তোমার মতই হাসিমুখে স্বার্থত্যাগ করতে পারে।

রমেশের চিত্তের সমস্ত কঠোরতা বিগলিত হইয়া গেল! রমা আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, এ আমার চোখে দেখে যাবার সময় হবে না ; কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি যতীনের দেহে তার পূর্বপুরুষের রক্ত আছে। ত্যাগ করবার যে শক্তি তার অস্থিমজ্জায় মিশিয়ে আছে শেখালে হয়ত একদিন সে তোমার মতই মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

রমেশ তৎক্ষণাৎ তাহার কোন উত্তর দিল না—জানালার বাহিরে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনের ভিতরটা এমন একটা ব্যথায় ভরিয়া উঠিতেছিল, যাহার সহিত কোনদিন তাহার পরিচয় ঘটে নাই। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটার পরে রমেশ মুখ ফিরাইয়া কহিল, দেখ, এ-সকলের মধ্যে আর আমাকে টেন না। আমি অনেক দুঃখকষ্টের পর একটুখানি আলোর শিখা জ্বালতে পেরেছি ; তাই আমার কেবল ভয় হয় পাছে একটুতেই তা নিবে যায়।

রমা কহিল, আর ভয় নেই রমেশদা, তোমার এ আলো আর নিববে না। জ্যাঠাইমা বলছিলেন, তুমি দূরে থেকে এসে বড় উঁচুতে বসে কাজ করতে চেয়েছিলে বলেই এত বাধাবিঘ্ন পেয়েচ। আমরা নিজেদের দুর্গতির ভাবে তোমাকে নাবিয়ে এনে এখন ঠিক জায়গাটিতেই প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েচি। এখন তুমি আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েচ বলেই তোমার ভয় হচ্চে ; আগে হলে এ আশংকা তোমার মনেও ঠাঁই পেত না। তখন তুমি গ্রাম্য সমাজের অতীত ছিলে,

আজ তুমি তারই একজন হয়েচ। তাই এ আলো তোমার ম্লান হবে না—এখন প্রতিদিনই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

সহসা জ্যাঠাইমার নামে রমেশ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; কহিল, ঠিক জানো কি রমা, আমার এ দীপের শিখাটুকু আর নিবে যাবে না?

রমা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, ঠিক জানি। যিনি সব জানেন এ সেই জ্যাঠাইমার কথা। এ কাজ তোমারি। আমার যতীনকে তুমি হাতে তুলে নিয়ে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে আজ আশীর্বাদ করে আমাকে বিদায় দাও রমেশদা, আমি যেন নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি।

বজ্রগর্ভ মেঘের মত রমেশের বুকের ভিতরটা ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু সে মাথা হেঁট করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। রমা কহিল, আমার আর একটি কথা তোমাকে রাখতে হবে। বল রাখবে?

রমেশ মৃদুকণ্ঠে কহিল, কি কথা?

রমা বলিল, আমার কথা নিয়ে বড়দার সঙ্গে তুমি কোনদিন ঝগড়া ক'রো না।

রমেশ বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল, তার মানে?

রমা কহিল, মানে যদি কখও শুনতে পাও, সেদিন শুধু এই কথাটি মনে ক'রো, আমি কেমন ক'রে নিঃশব্দে সহ্য করে চ'লে গেছি—একটি কথারও প্রতিবাদ করিনি। একদিন যখন অসহ্য মনে হয়েছিল সেদিন জ্যাঠাইমা এসে বলেছিলেন, মা, মিথ্যেকে ঘাঁটাঘাঁটি করে জাগিয়ে তুললেই তার পরমায়ু বেড়ে ওঠে। নিজের অসহিষ্ণুতায় তার আয়ু বাড়িয়ে তোলার মত পাপ অল্পই আছে; তাঁর এই উপদেশটি মনে রেখে আমি সকল দুঃখ-দুর্ভাগ্যই কাটিয়ে উঠেচি—এটি তুমিও কোনদিন ভুলো না রমেশদা।

রমেশ নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রমা ক্ষণেক পরে কহিল, আজ আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারচ না মনে করে দুঃখ ক'রো না রমেশদা। আমি নিশ্চয়ই জানি, আজ যা কঠিন বলে মনে হ'চ্চে একদিন তাই সোজা হয়ে যাবে, সেদিন আমার সকল অপরাধ তুমি সহজেই ক্ষমা করবে জেনে আমার মনের মধ্যে আর কোন ক্লেশ নেই। কাল আমি যাচ্চি।

কাল! রমেশ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবে কাল?

রমা কহিল, জ্যাঠাইমা যেখানে নিয়ে যাবেন আমি সেখানেই যাব।

রমেশ কহিল, কিন্তু তিনি ত আর ফিরে আসবেন না শুনচি।

রমা ধীরে ধীরে বলিল, আমিও না। আমিও তোমাদের পায়ে জন্মের মত বিদায় নিচ্চি।

এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইল। রমেশ মুহূর্ত-কাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আচ্ছা যাও। কিন্তু কেন বিদায় চাইচ সেও কি জানতে পারব না?

রমা মৌন হইয়া রহিল। রমেশ পুনরায় কহিল, কেন যে তোমার সমস্ত কথাই লুকিয়ে রেখে চলে গেলে সে তুমিই জানো। কিন্তু আমিও কায়মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, একদিন যেন তোমাকে সর্বান্তঃকরণেই ক্ষমা করতে পারি। তোমাকে ক্ষমা করতে না পারার যে আমার কি ব্যথা, সে শুধু আমার অন্তর্যামীই জানেন।

রমার দুই চোখ বাহিযা ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু সেই অত্যন্ত মৃদু-আলোকে রমেশ তাহা দেখিতে পাইল না। রমা নিঃশব্দে দূর হইতে তাহাকে আর একবার প্রণাম করিল এবং পরক্ষণেই রমেশ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পথে চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, তাহার ভবিষ্যৎ, তাহার সমস্ত কাজ-কর্মের উৎসাহ যেন এক নিমেষে এই জ্যোৎস্নার মতই অস্পষ্ট ছায়াময় হইয়া গেছে।

পরদিন সকালবেলায় রমেশ এ বাড়িতে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখন বিশ্বেশ্বরী যাত্রা করিয়া পালকিতে প্রবেশ করিয়াছেন। রমেশ দ্বারের কাছে মুখ লইয়া অশ্রুব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, কি অপরাধে আমাদের এত শীঘ্র ত্যাগ করে চললে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী ডান হাত বাড়াইয়া রমেশের মাথায় রাখিয়া বলিলেন, অপরাধেব কথা বলতে গেলে ত শেষ হবে না বাবা! তাতে কাজ নেই। তার পরে বলিলেন, এখানে যদি মরি রমেশ, বেণী আমার মুখে আগুন দেবে। সে হলে ত কোনমতেই মুক্তি পাব না। ইহকালটা ত জ্বলে-জ্বলেই গেল বাবা, পাছে পরকালও এমনি জ্বলেপুড়ে মরি, আমি সেই ভয়ে পালাচ্চি রমেশ।

রমেশ বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। আজ এই একটি কথায় সে জ্যাঠাইমার বুকের ভিতরটার জননীর জ্বালা যেমন করিয়া দেখিতে পাইল এমন আর কোনদিন পায় নাই। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া কহিল, রমা কেন যাচ্চে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী একটা-প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস যেন সংবরণ করিয়া লইলেন। তারপরে

গলা খাটো করিয়া বলিলেন, সংসারে তার যে স্থান নেই বাবা, তাই তাকে ভগবানের পায়ের নীচেই নিয়ে যাচ্চি ; সেখানে গিয়েও সে বাঁচে কিনা জানিনে, কিন্তু যদি বাঁচে সারা জীবন ধরে এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে অনুরোধ করব, কেন ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এতবড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনা দোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন ! এ কি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না এ শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের খেলা ! ওরে রমেশ, তার মত দুঃখিনী বুঝি আর পৃথিবীতে নেই। বলিতে বলিতেই তাঁহার গলা ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহাকে এতখানি ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে কেহ কখনও দেখে নাই।

রমেশ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বিশ্বেশ্বরী একটু পরেই কহিলেন, কিন্তু তোর ওপর আমার এই আদেশ রইল রমেশ, তাকে তুই যেন ভুল বুঝিস নে। যাবার সময় আমি কারো বিরুদ্ধে কোন নালিশ ক'রে যেতে চাইনে, শুধু এই কথাটা আমার তুই ভুলেও কখনও অবিশ্বাস করিস নে যে, তার চেয়ে বড় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী তোর আর কেউ নেই।

রমেশ বলিতে গেল, কিন্তু জ্যাঠাইমা—

জ্যাঠাইমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই রমেশ। তুই যা শুনেচিস সব মিথ্যে, যা জেনেচিস সব ভুল। কিন্তু এ অভিযোগের এইখানেই যেন সমাপ্তি হয়। তোর কাজ যেন সমস্ত অন্যায়, সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ ক'রে চিরদিন এমনি প্রবল হয়ে বয়ে যেতে পারে, এই তোর ওপর তার শেষ অনুরোধ। এইজন্যই সে মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করে গেছে। প্রাণ দিতে বসেচে রে রমেশ, তবু কথা কয়নি।

গতরাত্রে রমার নিজের মুখের দুই-একটা কথাও রমেশের সেই মুহূর্তে মনে পড়িয়া দুর্জয় রোদনের বেগ যেন ওষ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ নীচু করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে বলিয়া ফেলিল, তাকে ব'লো জ্যাঠাইমা, তাই হবে। বলিয়াই হাত বাড়াইয়া কোনমতে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সমাপ্ত